স্মৃতি ঃ আচার ও ধর্ম

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

অয়ন | কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪

প্রকাশক : অমল গুপ্ত

অয়ন | ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড (ত্রিতল), কলকাতা-৯

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ দাস

মুদ্রাকর প্রেস | ১০/১-সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন, কলকাতা-৩

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

দাম | দশ টাকা

SMRITI : ACHAR O DHARMA By DAKSHMINA RANJAN SASTRI
| PRICE : TEN ONLY

প্রকাশকের নিবেদন

'স্মৃতি : আচার ও ধর্ম' গ্রন্থটির এই শিরোনামেই সম্ভবত ইহার বিষয়বস্তু ব্যক্ত হইয়াছে। স্মৃ-ধাতুজ 'স্মৃতি' পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্মরণ। 'স্মৃতি' পদটিতে যাবতীয় ধর্মকার্যবিষয়ক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সর্ববিধ বিধি-নিষেধকেই বুঝাইয়া থাকে। স্মৃতি-শাস্ত্রেরই অপর নাম ধর্মশাস্ত্র। অবশ্য স্মৃতিশাস্ত্রের ধর্ম প্রচলিত অর্থে কেবল দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানাদি নহে। মীমাংসাসূত্রকার জৈমিনি ধর্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন— 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'—যে শ্রুতিবাক্য মানুষকে মঙ্গলজনক কার্যে প্রণোদিত করে তাহাই ধর্ম।

প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বিপুলায়তন এবং উহাতে বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত। এই বিষয়গুলির প্রকরণ অনুসারী বিন্যাস এবং বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তাহাকে সংক্ষেপে ও সহজ উপায়ে প্রকাশ করিয়া সাধারণের অধিগম্য করিবার প্রয়োজন ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল সেই সময়ে হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ শাস্ত্রানুগ বিধিবিধান বজায় রাখিতে আগ্রহী ছিলেন এবং সাধারণ মানুষও সেই বিধিবিধান পালনে ইচ্ছুক ছিলেন। এই কারণেই সেই সময়ের স্মার্ত পণ্ডিতগণ দুরূহ গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং অন্যান্য প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিয়া প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দেন। ইহাকে 'স্মৃতি' না বলিয়া 'স্মৃতিনিবন্ধ' বলাই সঙ্গত।

'নিবন্ধ' পদটি নি পূর্বক বন্ধ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ লইয়া নানা মুনির নানা মত। কেহ কেহ সাহিত্যবিষয়ক যাবতীয় রচনাকেই নিবন্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার অর্থ এই শাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার। স্মৃতিনিবন্ধের আলোচ্য-বিষয় প্রধানত ত্রিবিধ :— ১. আচার অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের আচরণ। ২. প্রায়শ্চিত্ত বা পাপক্ষালনার্থ অনুষ্ঠান। ৩. ব্যবহার বা আইন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'মনুস্মৃতি' বা 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি' প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থের যে সকল টীকা-ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছিল সেগুলি কিন্তু নিছক মূলের ব্যাখ্যাকর্মেই সীমাবদ্ধ নহে, বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতের সমালোচনা করিয়া, সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, নানাবিধ গ্রন্থ হইতে সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া এই

টীকাকার ও ভাষ্যকারগণ একপ্রকার নিবন্ধসাহিত্যেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুত এই সকল টীকা ভাষ্যের সহিত নিবন্ধের কোনওই পার্থক্য নাই।

সুতরাং স্মৃতিনিবন্ধগুলিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি: ১. বিশুদ্ধ নিবন্ধ। ২. টীকা নিবন্ধ। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব প্রথমটির এবং বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরাকে দ্বিতীয়টির উদাহরণ বলা যায়।

স্মৃতিনিবন্ধগুলি তুলনায় অর্বাচীন বলিয়া ইহাকে 'নব্যস্মৃতি' এবং মন্বাদি কর্তৃক শ্লোকাকারে রচিত স্মৃতিগ্রন্থ ও আপস্তম্বাদি কর্তৃক সূত্রাকারে রচিত ধর্মসূত্রগুলিকে 'প্রাচীন স্মৃতি' বলা হয়।

ভারতের নানাস্থানেই নব্যস্মৃতির বিভিন্ন সম্প্রদায় রহিয়াছে। যথা বঙ্গীয় স্মৃতি, মৈথিল স্মৃতি ইত্যাদি। প্রাচীন স্মৃতিকে অবলম্বন করিলেও নব্যস্মৃতিকারগণ স্মৃতির ব্যাখ্যায় অভিনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য এই অভিনবত্বের মূলে আছে নব্যস্মৃতিকারগণের দেশাচারের প্রতি আনুগত্য ও প্রাচীন স্মৃতির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস।

'স্মৃতি: আচার ও ধর্ম' গ্রন্থটিতে আচার ও প্রায়শ্চিত্তের অনুপুঙ্খ আলোচনা থাকিলেও লক্ষ্য করিবার বিষয় স্মৃতিনিবন্ধের অপর আর একটি শাখা ব্যবহারবিধি বিষয়ে কোনও আলোচনা নাই। পক্ষান্তরে, ঠিক স্মৃতিনিবন্ধ নহে এমন কিছু রচনাও এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় স্থান পাইয়াছে। ইহার কারণ, প্রয়াত ডক্টর শাস্ত্রীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের ইহা একটি সংকলন মাত্র। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনার অবকাশ তিনি পান নাই। তদুপরি গ্রন্থবদ্ধ করিবার পূর্বে লেখক কর্তৃক নিবন্ধগুলির পুনর্মার্জনাও এক্ষেত্রে সম্ভব হয় নাই। এমতাবস্থায় এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব আমাদেরই।

স্মৃতিশাস্ত্রে বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য বিধানের যে রীতি আছে সেক্ষেত্রে ডক্টর শাস্ত্রীর অধিকার সুবিদিত। ভারতীয় বস্তুবাদের উপর সংস্কৃত ইংরাজী ও বাংলাভাষায় লিখিত তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার Origin and Development of the Rituals of Ancestor worship in India নামক বিপুলায়তন গ্রন্থটি স্মৃতিনিবন্ধের একটি আকর গ্রন্থ। ভারতীয় বস্তুবাদের উপর লিখিত বাংলাভাষায় 'চার্বাক দর্শন' নামে একটি গ্রন্থ আছে, কিন্তু স্মৃতিনিবন্ধের উপর বাংলা ভাষায় তাঁহার কোনও গ্রন্থই নাই। এই দিক্ হইতে বর্তমান গ্রন্থটি যে সুধীসমাজে সমাদৃত হইবে তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ।

সূচিপত্র

সংগ্রহসূত্র

গোড়ার কথা / ভাষা সমস্যা ও মীমাংসা ১৩৩৬ আষাঢ়

স্মৃতিকথা : আচার ও ধর্ম / দর্পণ ১৩৬৭ আশ্বিন

পিতৃযজ্ঞ / কালপুরুষ ১৩৬৮ আশ্বিন

বেদে নারীর অধিকার / গৌরীমাতা শতবর্ষ স্মারক-গ্রন্থ ১৩৬৪ অগ্রহায়ণ

বৈদিক চিন্তায় ভিন্ন সুর / প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ১৩৬৬ আশ্বিন

প্রজ্ঞাপরিমিতি / দ্বন্দ্ব ১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ

ভয়ঙ্করীর উপাসনা / গাঙ্গেয় ১৩৬৪ আশ্বিন

অবশিষ্ট নিবন্ধগুলি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় প্রাপ্ত, পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

গোড়ার কথা

আমরা 'রাজা রামমোহন ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা গদ্য সাহিত্যের আলোচনা' প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে পণ্ডিতগণ যখন 'শ্রীশ্রীগুরুদেব-চরণারবিন্দ দ্বন্দ্ব-মকরন্দ-অজ্ঞান তিমিরান্ধ-জনসমূহের জ্ঞানাঞ্জনন্যায় সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তরে নিরন্তর চিন্তা করিয়া তস্য চরণপ্রান্তে কোটি কোটি প্রণাম পূর্ব্বক' 'এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড দেখিয়া ও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ড ভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তিভাণ্ডভঞ্জন করিতেছিল এবং গবাপণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জন্মিয়া ও গণ্ডকীস্থ গণ্ডশিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছিল' এবং 'পরম প্রণয়ার্ণব গভীরনীরতীর নিবসিত কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত হইয়া ঝটিতি ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপন' করিতেছিল তখন মৌলবীগণ 'খাজানাতে সৈন্য মুর্চাবন্দি করিয়া মজ্‌বুতিতে আপন মলকে কর্ত্তৃত্ব' করিতে করিতে 'সাহাজাদি সখিসোনা সোনার মধ্য হইতে পয়দা হইবার বিবরণ, উজিরনন্দনের মাণিক পয়দা হইবার বয়ান ও দোবারা মালিনীর হাতে আফতে গিরিবার বয়ান' লিখিতে ছিল। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃত বা ফার্সি শব্দের বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইত।

এই দ্বিবিধ উৎপাতের মধ্যে নূতন আর এক উৎপাতের আবির্ভাব হইল—বঙ্গভাষা গগনে এই সংস্কৃত বা ফার্সিবহুল রচনার পার্শ্বে চল্‌তি বাংলা আসিয়া স্থান পরিগ্রহ্ করিল। এই নূতন উৎপাতের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল প্রমথনাথ শর্মার 'নববাবু বিলাস'-এ। তাহার পর প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের তুলাল'-এ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা'য় এই ভাষা প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন বা সাধুভাষার সহিত প্রতিযোগিতায় উদ্যত হয়। এই বিবাদের ফলে বঙ্গভাষা জননীর সেবকগণের মধ্যে যে সমস্যার উৎপত্তি হয় তাহাকেই এখানে ভাষা-সমস্যা বলা হইয়াছে। এই সমস্যার আলোচনাই এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

যে কোনও কারণেই হউক মৌলবীগণের প্রভাব কথঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। তখন তুইটী সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল—একটি সংস্কৃত পন্থী অপরটি অপরপন্থী। সংস্কৃতপন্থীদলের ভাষার নাম হইল সাধুভাষা, অপরপন্থীদলের ভাষাকে ঠিক অসাধু ভাষা না বলিলেও কথোপকথনের ভাষা বা চল্‌তি ভাষা বলা হইত। সাধুর দল অসংস্কৃত শব্দকে বাংলা রচনায় প্রবেশ করিতে দিতে নারাজ। সংস্কৃত সমাসবহুল রচনাদ্বারা বঙ্গভাষা-জননীর অঙ্গকে ভারাক্রান্ত করিতে পারিলেই তাহাদিগের বিবেচনায় রচনা সাফল্যমণ্ডিত হইত। অপরপন্থীদলের বিবেচনায় রচনাতে যত অধিক প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হইবে ততই মঙ্গল। সংস্কৃতের কচকচিকে বঙ্গভাষার ত্রিসীমায়ও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। হিন্দি-উর্দু প্রভৃতি শব্দকে অবাধে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত শব্দকে কদাপি নহে। অপরপন্থীদিগের মধ্যে আবার তুই সম্প্রদায়—টেকচাঁদি ও হুতোমি বা বীরবলি। টেকচাঁদি ভাষা একেবারে চল্‌তি কথ্যভাষা নহে। ইহাতে 'করিয়াছি' 'গিয়াছিলাম' প্রভৃতি লিখিত ভাষার ক্রিয়া পদগুলিও প্রযুক্ত হইয়াছে। তবে শব্দগুলি চল্‌তি ভাষা হইতে গৃহীত। হুতোমিভাষা সম্পূর্ণরূপে কথিত ভাষা। ইহাতে ক্রিয়া পদগুলি 'করেছে' 'গিয়েছে' ইত্যাদি। এই তুই সম্প্রদায়ই প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং সাধু বা বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগের বিদ্বেষী। স্থতরাং প্রথমে এই তুই দলকে একটা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ধরিয়া আলোচনা করিব।

এই তুই চরমপন্থীর দল যখন পরস্পরের বিনাশের জন্য হাতাহাতি আরম্ভ করিল, যখন পণ্ডিতের দল—'পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া এরূপভাষা ব্যবহার

...তে পারে না' সুতরাং বঙ্গভাষা হইতে এরূপ ভাষাকে সত্বর অপসারিত করিতে হইবে বলিয়া আলালি ভাষার নিন্দা করিতে থাকেন তখন অপরপন্থীর দল বঙ্গভাষা হইতে গণ, জনৈক, ভ্রাতা কন্য, কর্ণ. স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, প্রভৃতি শব্দকে ও 'ত্ব' ও 'য' প্রত্যয়ান্ত শব্দকে এবং সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দকে নির্বাসিত করিয়া তাহাদিগের আসনে রা, গুলি, ভাই, কাল কান, সোনা, মাথা তামা. পাতা, প্রভৃতি শব্দকে বসাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় লিঙ্গভেদ তাঁহাদিগের চক্ষুঃ শূল। এরূপ সময়ে সামঞ্জস্যের জন্য মীমাংসার প্রয়োজন হইল।

একদল বলিতেছে কোনও প্রাণীরই হিংসা করিও না, অপর দল বলিতেছে যজ্ঞে পশুর আলম্ভন করিবে। এই করিবে না এবং করিবের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইল, একদলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। মীমাংসাশাস্ত্রের উৎপত্তি হইল। মীমাংসা বলিলেন—যজ্ঞে আলম্ভন হিংসা শব্দবাচ্য নহে সুতরাং করিবে। উভয়দলের বিবাদ মিটিয়া গেল। জৈমিনির জয় হইল কিন্তু। নাস্তিকগণ তাহা মানিল না।

বঙ্গসাহিত্য জগতেও তাহাই হইল, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য জৈমিনির বেশে বঙ্কিমের আবির্ভাব হইল। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব ও পরবর্তী সাহিত্যের অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গভাষার ধাত বুঝিয়া লইলেন। বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে মস্তক বা মাথা কোনটীকেই পৃথক করিলেন না—ভাইরে ও হে ভ্রাতঃ, ঘর ও গৃহ, কাহাকেও পরিত্যাগ করিলেন না। কেবল ভাই ভাব, ভাইগিরি বা গৃহের ছেলেকে তিনি নির্বাসিত করিলেন। তিনি সাধু দলের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন -পণ্ডিতী দলের বাংলা বাংলাই নয়। আবার অন্যদলকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—হুতোমিভাষা অসুন্দর, হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, হুতোমি ভাষা দরিদ্র। বাংলার লিখন-পঠন হুতোমি ভাষায় কখনই হইতে পারে না। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। তিনি অতি নিপুণতার সহিত সিদ্ধান্ত করিলেন—রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন স্পষ্টতা এবং সরলতা। নিষ্প্রয়োজনে সামান্য ছাড়িয়া সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় গ্রহণে তাঁহার বিশেষ আপত্তি। কিন্তু প্রয়োজন হইলে বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিবার জন্য ইংরাজী, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে তাহাতে আপত্তি নাই।

গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তামম বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। সুতরাং তিনি বিষয়-বস্তু অনুসারে সাধু এবং চল্‌তি উভয়বিধভাষার ব্যবহারই অনুমোদন করিলেন। কাহাকেও নির্বাসিত করিলেন না, কাহাকেও শীর্ষস্থান প্রদান করিলেন না—উভয় পক্ষেরই একটা সামঞ্জস্য হইল, মীমাংসা ঘটিল।

কিন্তু সকলে এ মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইল কৈ? দলাদলি কথঞ্চিৎ মিটিলেও একেবারে মিটিল না। শরৎশাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য এবং ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্গভাষাকে অমর করিবার জন্য সর্ববিধ বাংলা রচনার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ সমর্থন করেন। এই মতকেই সমর্থন করিয়া শশাঙ্কশেখর সেন বলিয়া বসিলেন—আর্য ভাষার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিলে, বহু ধনবতী প্রাচীনা বাণীর সঞ্চিত সম্পত্তি উপেক্ষা করিলে, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার পরম শোণিত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা বিস্মৃত হইলে, বঙ্গসাহিত্যের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ করা হইবে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বঙ্কিমের যুক্তিবলে বীরবলের বল লাভ করিয়া চল্‌তি বাংলার টান টানিয়া বলিতে লাগিলেন "ঘরের ছেলে ঘরে যাও ঘরের ভাত বেশী করে খাও।" আবার রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধনের ডোর' ছিন্ন করিয়া 'মনোসাধে' 'চাঁদনা' ও 'চাঁদিমার' কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিলেন দেখিয়া কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবিকে গ্রাস করিবার জন্য রাহুরূপ ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"গ্রাম্যকথা, শুদ্ধকথা, একত্র মিশায়ে ধরে। শকটচড়া গাড্যারোহণ গড়িব সমাস করে।" বিবাদ জোর চলিল। কেহ সাধুর পক্ষে, কেহ বা অসাধু না হইলেও চল্‌তির পক্ষে। কিন্তু এ বিবাদ কেবল শব্দ লইয়া। শব্দই ভাষার প্রাণ নহে কেবল শব্দসম্পদ দেখিয়া কোনও ভাষার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায় না, ভাষার বৈশিষ্ট্য রচনা-ভঙ্গী ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে।

বাংলা ভাষায় সাধু এবং অসাধু এই দ্বিবিধ শব্দই যে প্রয়োগার্হ ইহাই বঙ্কিমের চরম সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তকে অদ্যাপি কেহ সদ্‌যুক্তিবলে দূষিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমরা জানিনা। সাধু ও অপভ্রংশ শব্দের বিবাদ কথঞ্চিৎ মিটিল বটে কিন্তু হুতোমি দলের সহিত বিবাদ মিটিল কৈ? একদিকে মধ্যপন্থীদল অপর দিকে হুতোমি বা বীরবলি দল। একদল বলিতেছেন 'বাণীর' বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায় যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখ্‌তে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার

বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়! ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।' হুতোমি দলের এই মন্তব্যে, নিরপেক্ষ হইলেও, মধ্যপন্থী হইলেও, সাধুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াই যেন বঙ্কিম নানা যুক্তি দেখাইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন—যিনি যত চেষ্টা করুন লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্যজ্ঞাপন লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান—চিত্তসঞ্চালন। হুতোমি ভাষা নিস্তেজ। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই তরফ হইতেই বলিয়াছিলেন—ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণের জন্য লিখিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবশ্যক যদি কলিকাতার কথিত 'গেলুম্' লিখিত রচনায় স্থান পায় তাহা হইলে শ্রীহট্টের 'গ্যাছ্‌লাম' বা 'যাইবাম্' সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? অধিকন্তু ইহাতে ভাষার একটা সার্বজনীন আদর্শ নষ্ট হইবে।' রণভেরী বাজিয়া উঠিল—কবিশেখর কালিদাস রায় স্বয়ং পণ্ডিতগন্ধী হইলেও হুতোমি দলের বেশ ধরিয়া বলিয়া ফেলিলেন—চল্‌তি ভাষার চলন সম্বন্ধে একটা বড় আপত্তি ছিল এই যে, দুরূহ ভাবঘন, তত্ত্বগহন বিষয়গুলিকে এ ভাষায় পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দেওয়া যায় না। এ আপত্তির কোন মূল্য নাই—ভাববৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের পরিণত-বয়সের গভীরতম গহনতম ভাবুকতাই যদি এ চলিতভাষায় রসাত্মকরূপ ধারণ করিতে পারে তবে আর কোন্ আপত্তি চলিতে পারে? কবিশেখরের চলিত ভাষাতেও 'দুরূহভাবঘন তত্ত্বগহন বিষয়গুলি গভীরতম গহনতম ভাবুকতায় রসাত্মকরূপ ধারণ' করিয়াছে।

দীনেশবাবুর আপত্তির উত্তরে কবিশেখর বলিয়াছেন—ইতর লোকের মুখের ভাষা সাহিত্যের দরবারে চলিবে না, ভদ্র শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষাই সাহিত্যের অবলম্বনীয় চল্‌তি ভাষা। দেশের শিক্ষা দীক্ষার কেন্দ্রস্থলের ভাষাই তাহাদের মুখের ভাষা। সুতরাং তাঁহার মতে 'গেলুম' ভিন্ন 'গ্যাছলাম' বা 'যাইবাম' কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখের ভাষা হইতে পারে না। বিশেষ মতভেদ হইলে প্রাদেশিক ভাষার অভিধানের সাহায্যে তাহার সমাধান করিতে হইবে। সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয় 'মৃতমারণ' ন্যায় অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমকে আক্রমণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'হুতোমিভাষা যে নিস্তেজ তা কখনই স্বীকার

করবো না। তাতে দস্তুরমত জোর আছে। উত্তর, দক্ষিণ ; সাদা, কালো বা তেল, জলের মধ্যে আপোষ অসম্ভব। চল্‌তি ভাষা হাজার হলেও সত্যভাষা আর সাধুভাষা মিথ্যা ভাষা—সত্যেও মিথ্যায় মেশালে উত্তম এজাহার হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হতে পারেনা। বঙ্কিমের আপোষ, আপোষই নহে।' বঙ্কিমকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঘটক মহাশয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে সেই আসনে বসাইলেন—"চৌধুরী মহাশয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোন শব্দই বাদ দেন না যদি তা শিক্ষিত বাঙালী মহলে চলে গিয়ে থাকে এবং ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়—'তাতে করে এই হল'—'মোট কথা হচ্ছে এই' এই বাংলাই আমরা অন্তরে অন্তরে চাই—এই বাংলাই যেন দেশের লোক হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল—তিনি হাতে তুলে দিলেন।" দেখিয়া শুনিয়া সাধুর দল নির্বাক হুতোমি দলেরই জয় হইল। সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পর্যন্ত 'বিজলি'র আলোকে চমক খাইয়া এই দিকেই ভোট দিলেন—কিন্তু বিবাদ মিটিল না।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন 'সতীশচন্দ্রের বাঙলার মত একেবারে সংস্কৃত-ছুট বাঙলা আমি লিখতে পারিনে, যদিচ অসাধু ভাষার প্রধান পাণ্ডা বলে আমি গণ্য।' ইহাতে মানসী বলিবেন—'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়',—তাঁহার তথা-কথিত শিষ্যেরা গুরুর গুণগুলির অনুকরণ করিতে না পারিয়া, কেবল মাত্র চল্‌তি কথার ব্যবহার করিয়া ভাষার সৌন্দর্য ও গুরুত্বের হানি করিতেছেন। শনিমণ্ডল সাধারণতঃ কুগ্রহ হইলেও এ সময়ে সাধুর প্রতি সদয় হইলেন। বঙ্কিম ও দীনেশের মর্যাদা কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইল। মাঘের সংখ্যায় 'ঘটক-চৌধুরী' সংবাদে শনিমণ্ডল ঘটক মহাশয়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বঙ্কিম রবীন্দ্র প্রভৃতির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা পাইলেন। শনিমণ্ডল বলেন 'রবীন্দ্রনাথের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট রচনা তাহার ভাষা আর যাই হোক মৌখিক ভাষা নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী গদ্য হইতে আধুনিক ইংরাজী গদ্য পর্যন্ত ভাষার যে ভঙ্গী দাঁড়াইয়াছে তাহা ইংরাজ সমাজের মৌখিক ভাষা নহে—এমন কি ইংরাজ যে ভাষায় সাধারণতঃ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বক্তৃতা করে তাহাও বৈঠকী মৌখিক ভাষা নহে। বায়রণ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ বাবু সমাজকে *বিদ্রূপ করিবার জন্য সেই সমাজের মৌখিক ভাষায় তাঁহার Don Juan রচনা* করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্য যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন বঙ্কিম তাঁহার

ঐ ভাষা লইয়াই উচ্চতম আসনে বিরাজ করিবেন।' আজ যদি সমাজপতি সুরেশচন্দ্র বা মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বঙ্কিমের তথা সমগ্র সাধুসমাজের এই অবমাননায় বোধ হয় এই সুরেই কথা কহিতেন।

কিন্তু ইহাতেও ত বিবাদ মিটল না—সমস্যার সমন্বয় বা মীমাংসা হইল না। স্বামীজীর ভক্তশিষ্যগণ গুরুপ্রদর্শিত যুক্তিজাল বিস্তার করিলেন। সমস্যা পূর্ববৎ রহিয়া গেল—'যে ভাষায় ঘরে কথা কও তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর—স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না। ও ভাষায় যেমন জোর, তেমন অল্পের মধ্যে অনেক। যদি বল বাংলাদেশের স্থানে স্থানে বকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ কর্‌বো—প্রাকৃতিক নিয়মে যেটা বলবান হচ্চে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটাই নিতে হবে। অর্থাৎ কল্‌কেত্তার ভাষা।—কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতের বেশী নিকট সে কথা হচ্ছে না - কোন্ ভাষা জিত্‌ছে সেইটা দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে কল্‌কেত্তার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাংলাদেশের ভাষা হয়ে যাবে তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরের কথা কওয়া ভাষা এক কর্‌তে হয় ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তি স্বরূপ করবেন।' কথিত ভাষাকে লিখিবার ভাষা করিতে গেলে এইরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন উপায় নাই।

স্বামীজীর এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু বাংলাদেশের সকল প্রদেশের লোকের পক্ষে কলিকাতার ভাষাভাষী হওয়া সহজ সাধ্য নহে! স্বামীজী কলিকাতার লোক—পূর্ববঙ্গের কোনও লোকের পক্ষে কলিকাতার ভাষায় ব্যবহৃত ৺ বা ড় উচ্চারণ করিতে বা ইহাদিগের ব্যবহার আয়ত্ব করিতে যে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় তাহা বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তবে যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানের ভাষাই গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে দেশের শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্রস্থানের যে ভাষা তাহাই রচনায় প্রয়োগার্হ। কিন্তু কবিশেখর যে বলিয়াছেন দেশের শিক্ষিত লোকের ভাষা স্বভাবতঃ একরূপ হইবে, ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ কলিকাতা দর্শন না করিয়াও কলিকাতার ভাষা-ভাষীর সংসর্গে না আসিয়াও উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি প্রয়াস করিয়া এক ভাষা ভাষী হইতে হয়, তাহাও সহজ সাধ্য নহে। এত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া একটি প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা করা অপেক্ষা

সাহিত্যের জন্য একটু মার্জিত, রুচিসম্পন্ন, তোলা ভাষার আশ্রয় লইলেই বা দোষ কি? অবশ্য সে ভাষাটিকে যাহাতে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায় তাহা করিতে হইবে। সে ভাষা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষার ন্যায় সরল সহজ চলতি ভাষারই কাছাকাছি হইবে কিন্তু হুতোমি নহে। স্বামীজীরও বোধ হয় খটমট ভাষা ব্যবহারেই আপত্তি। শাস্ত্রকারগণের বিধিবাক্যের সহিত ব্যবহারের বিরোধ ঘটিলে বিধি ও ব্যবহার উভয়কেই সমান আদর দেওয়া হইয়া থাকে। স্বামীজী মুখে চল্‌তি ভাষা ব্যবহারের বিধান করিলেও কার্যতঃ তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সংস্কৃতশব্দবহুল, ওজঃপূর্ণ, মন্থরগতি-বিশিষ্ট, শুচিমার্জিত, অনবদ্য ও সুনির্বাচিত বিশেষণের ঐশ্বর্যে সমারোহময়। তাহা সর্বত্র আটপৌরে চল্‌তি বাংলা নহে। অলঙ্কারের ভারাতিশয্যে আপত্তি থাকিলেও অনাবৃত যুবতী মূর্তি দেখিয়া কোনও রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিই বোধ হয় সুখী হইবেন না। যদিও অনাবৃত মূর্তিই নরনারীর স্বাভাবিক মূর্তি। এই অনাবৃত ভাব ও ভাষাকে বিদ্রূপ করিয়াই বোধ হয় কোনও আধুনিক কবি বলিয়াছেন—

রক্তমাংসে গঠিত মানুষ,
মিথ্যা ভাবলোকে কভু উড়াবে না কল্পনা ফানুষ,
হাসি পেলে হাসিবে সে, রাগ হলে চেলা কাঠ লয়ে
পত্নীর ফাটায়ে মাথা, নাস্তা খাবে আপন আলয়ে
ও পাড়ার কদমেরে চোখে যদি লাগে তার ভালো
ধরিয়া করিবে সাঙ্গা উচ্চকণ্ঠে কহিবে নিকালো,
সখ মিটে গেলে তার—

সুতরাং কিঞ্চিৎ আবরণ আবশ্যক। ঘরে যেরূপ অবস্থাই থাক বাহির হইবার সময় অন্ততঃ গেঞ্জি ও চটিজুতাটি পরিয়া বাহির হইবে, ইহাতে স্বাভাবিকতা নষ্ট হইবে না! অনেক বিবাদের মিটমাট হইবে।

বর্তমান যুগে পণ্ডিতি বাংলার কেহই পক্ষপাতী নহেন। সুতরাং তাহা আপন হইতেই কালে বিলীন হইবে। আমাদিগের কোনরূপ প্রয়াস করিতে হইবে না। অপর চরমপন্থীদিগের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেন—'যদি ভদ্র সমাজের মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয় তা হলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। যে শব্দ, যে বাগভঙ্গী যে বাক্য বিন্যাস প্রণালী আপনা হতে বাংলায়

ঢুকেচে ও চলেচে তাই বাঙালীর গ্রাহ্য। তিনি আরবী, ফার্সি, হিন্দী, সংস্কৃত ইংরাজী কোন শব্দ বাদ দেন না যদি তা শিক্ষিত বাঙালী মহলে চলে গিয়ে থাকে এবং ভাবপ্রকাশের উপযোগী হয়।' তাঁহার ভক্ত শিষ্য ঘটকমহাশয়ও বিচারক্ষেত্রে এই মতই পোষণ করিয়া থাকেন। কবিশেখরমহাশয়ও এই সুরেই বলিয়াছেন—ভদ্র শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষাই সাহিত্যের অবলম্বনীয় চল্‌তি ভাষা! ইতর লোকের মুখের ভাষা সাহিত্যের দরবারে চলিবে না। সুতরাং এই অপর দলের প্রায় সকলেই সাধু, মার্জিত, আবৃত ভাষার পক্ষপাতী, কৃষকের সরলপ্রাণের অশুদ্ধ অসাধুভাষার ইহাদিগের সাহিত্যে স্থান নাই। সত্যের আবিষ্কারই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে, সত্যকে সরস সুন্দর করিয়া উপস্থাপনই উদ্দেশ্য। এই গণতন্ত্রের যুগে, উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে এই অনুদার নীতি অবলম্বন করিয়া সাধুর পক্ষ, শিক্ষিতের পক্ষ, অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করিয়া, এই দল কি বঙ্গভাষাকে আরও এক নূতন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন না? হইতে পারে সে শৃঙ্খল রত্নময়—তথাপি ত শৃঙ্খল।

কিন্তু একটি কথা, বঙ্কিমের সহিত এই সম্প্রদায়ের বিবাদ কোথায়? বঙ্কিমও কি আবশ্যক হইলে ইংরাজী, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত গ্রাম্য বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহার গ্রহণ সমর্থন করেন নাই? বঙ্কিমও কি হুতোমিভাষা অসুন্দর বলিয়া হুতোমিভাষা অশিক্ষিতের ভাষা বলিয়া, তাহার অব্যবহার্যত্ব প্রতিপাদন করেন নাই? শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে সাধুপদ প্রয়োগ, শিষ্টের প্রয়োগ, অভিযুক্ত ব্যবহৃত পদের প্রয়োগ সর্ববাদি সম্মত—তথাকথিত সাধুপদ প্রয়োগে সকলেরই আপত্তি।

প্রয়োজন হইলে হুতোমি ভাষা—অসাধু ভাষা—অশিক্ষিতের ভাষা গ্রহণেও বঙ্কিমের আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। স্বামী বিবেকানন্দ 'কল্‌কেতার ভাষা' বলিতেও বোধহয় শিক্ষিতের ভাষাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্কিমের মতের সহিত ত ইহাদিগের কোন বিরোধ দেখিতেছি না। তবে বিরোধের মধ্যে ক্রিয়ার রূপান্তর। অবশ্য কথোপকথনে ইহার প্রচলন বাঞ্ছনীয়। তবে 'কলকেতার ভাষা জিতেছে' একথাও জোর করিয়া বলা যায় না। রাজধানী পরিবর্তিত হইয়াছে, ঢাকায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কালে আরও কত কি হইবে। কে বলিতে পারে যে শিক্ষার কেন্দ্রস্থানের ভাষা বলিতে ঢাকার ভাষাও বুঝাইব না? সুতরাং কেবল কল্‌কেতার যাচ্ছি খাচ্ছি শুচ্ছি

গ্রহণ এবং গ্যাছলাম যাইবাম শুইবামের বর্জন না করিয়া যাহা সকল বাঙালীর ভাষা সেই সার্বজনীন আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে বোধ হয় বঙ্গভাষার ক্ষেত্রে এই স্বপক্ষ ক্ষয়কারক বিবাদের মূলোৎপাটন সহজেই হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। 'গেছলুম' 'যাইবাম' প্রভৃতি সর্ববিধ প্রাদেশিক চলতি প্রয়োগের গ্রহণ বা ঐরূপ ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া লিখিত ভাষায় প্রচলিত 'গিয়াছিলাম' প্রভৃতি সাধু ক্রিয়াপদের গ্রহণ। উভয়েরই প্রয়োগ ব্যবহার দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে। চলতি ক্রিয়া পদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত 'গেছলুম' প্রভৃতির প্রয়োগ দেখাইবার জন্য বেশী হাতড়াইতে হইবে না। নাট্য-সাহিত্য ও তরুণ সাহিত্য এইরূপ প্রয়োগেই পরিপূর্ণ। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'যাইবাম্ "শুন্যা" 'ডাক্যা' 'ফির্যা' প্রভৃতির প্রয়োগও ময়মন্‌সিংহের গীতিকা পূর্ববঙ্গগীতিকা প্রভৃতিতে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়বিধ চল্‌তি ক্রিয়ার প্রয়োগই শিষ্টসম্মত – ব্যবহৃত। সুতরাং 'গেছলুম' গ্রহণ করিতে হইলে 'যাইবাম্'কে কোন রূপেই সাহিত্যের দরবারে বর্জন করা চলিবে না। সকল প্রাদেশিক ক্রিয়াপদের ব্যবহারই সমর্থন করিতে হইবে, সকলকেই সৎসাহিত্যে স্থান দিতে হইবে। এই সকল প্রয়োগের নিয়ামক হইবে বাংলাভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ। তাহা অদ্যাপি নির্মিত হয় নাই। প্রাচীন ও নবীন সর্ববিধ বাংলা সাহিত্যের প্রয়োগ দেখিয়া ইহাদিগকে নির্মাণ করিতে হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে বাংলা ভাষার এরূপ সম্পূর্ণ ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হইলেই বাংলাভাষার বর্তমান সমস্যার যথার্থ মীমাংসা হইবে।

যাহা হউক দেশের শিক্ষিত লোকের যে ভাষা তাহাই রচনায় প্রয়োগার্হ— এবিষয়ে কোনও মতাবলম্বীরই বোধ হয় বৈমত্য নাই। কিন্তু ভাষা ভাবের বাহন। যেরূপস্থলে পূর্বোক্ত প্রকারের ভাষায় ভাবের সম্যক্ অভিব্যক্তি ঘটে না, সেরূপ স্থলে যেকোনরূপ ভাষায় ভাবের সম্যক্ অভিব্যক্তি সাধিত হয় তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। অশিক্ষিতের, অশিষ্টের, অনভিযুক্তের ভাষারও। ইহাতে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপত্তি করিবেন? অধিকন্তু এই শতবর্ষব্যাপী অথবা শতবর্ষই বা বলি কেন, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে শত বর্ষব্যাপী হইলেও ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে ন্যূনাধিক সার্ধদ্বিসহস্র বর্ষব্যাপী আলোচনায়

ফলে ইহাই সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। ইহাই চরম সিদ্ধান্ত কি না সাহস করিয়া বলিতে পারি না—'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ'।

ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় নূতন তুরস্কের মুস্তফা কামাল যেরূপ নবনবোন্মেষ-শালিনী বুদ্ধির প্রভাবে ফার্সি ও আরবি কথা ও বচন ভঙ্গীকে পর্যন্ত তুরস্ক হইতে নির্বাসিত করিয়া অতীতের চিহ্ন পর্যন্ত নির্বিকারে মুছিয়া ফেলিয়াছেন সেইরূপ বঙ্গ-সাহিত্য হইতে প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের সর্ববিধ প্রভাবকে দূরীভূত করিবার জন্য, সকল সম্পর্ক অস্বীকার করিবার জন্য যে যুগের প্রতিভাবান সংস্কারকগণ দৃঢ়সঙ্কল্প সে যুগের যাহা বিষম সমস্যা তাহা দ্বিসহস্র বা সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে আমরা সমাহিত দেখিতে পাই। ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে জৈমিনি তাঁহার পূর্ব মীমাংসা দর্শনের 'সাধুপদ প্রযুক্ত্যধিকরণে' এই ভাষা সমস্যার কথা উত্থাপন করিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। তখনকার সমস্যাতেও সাহিত্যিক-গণের মধ্যে তিনটী সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। একদল বলিতেছিল—'ন ম্লেচ্ছিতৈ বৈ নাপভাষিত বৈ'—ম্লেচ্ছ ভাষা অশিষ্টের ভাষা অসুন্দর ভাষা অপভাষা প্রয়োগ করিবে না। এই বৈদিক সম্প্রদায় কে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বুদ্ধদেব বলিয়া বসিলেন 'সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়া-পুণিতুম্ভি' 'হে ভিক্ষুকগণ বুদ্ধবচনকে নিজের ভাষাতেই গ্রহণ করিবার জন্য আমি অনুজ্ঞা করিতেছি', যমেল ও উতেকুল নামে দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা ভিক্ষু হইয়া একদিন বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন—ভগবান্ সম্প্রতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও জাতি কুলের প্রব্রজিতগণ নিজের ভাষায় বুদ্ধচনকে দূষিত করিতেছে। আমরা তাহা সংস্কৃতে আরোপিত করিতে চাহি। বুদ্ধদেব তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচনকে তথাকথিত সাধু ভাষায় পরিবর্তিত করিতে হইবে না। যে করিবে তাহার দুষ্কৃত নামক অপরাধ হইবে। মাগধী ছিল তখনকার চল্‌তি ভাষা। তিনি তাহারই সমাদর করিলেন। দুই চরমপন্থীতে বিবাদ লাগিয়া গেল অপর একদল উঠিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন—অপভ্রংশ এবং সাধু উভয়বিধ শব্দেরই অর্থবোধনসামর্থ সমান, সুতরাং উভয়-বিধ শব্দই প্রয়োগার্হ। কিন্তু ইহাতেও বিবাদ মিটিল না। অবশেষে জৈমিনি আসিয়া বিবাদ মিটাইলেন 'গো' প্রভৃতি সাধু শব্দই প্রয়োগ করিবে। 'গাভী' প্রভৃতি সাধু শব্দকে সাহিত্যে স্থান দিবে না। শিষ্টগণ, শিক্ষিতগণ যে শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করেন তাহাই

সাধু—শিক্ষিতগণের ভাষাই সাধুভাষা। তাহাই প্রয়োগার্হ। একটা কিছু মীমাংসা হইল। কাব্যালঙ্কারসূত্রপ্রণেতা বামনও অমনি সুর ধরিলেন—'অতীব কবিভিঃ প্রযুক্তং দেশভাষা পদং প্রযোজ্যং'। কে এই কবি? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়। তবে কি অসাধুভাষা অশিষ্টভাষা অশিক্ষিতের ভাষা, সাহিত্যের দরবারে কুত্রাপি স্থান পাইবে না? জৈমিনি 'ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধার্থ প্রমাণ্যাধিকরণে' এই প্রশ্নেরও একটা সমাধান করিয়াছেন—'আর্য্য প্রসিদ্ধ্যবিরোধ ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধিরপি প্রমাণম।' যে স্থলে আর্যের ভাষা, শিষ্টের ভাষা, শিক্ষিতের ভাষা ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য যথেষ্ট না হইবে—ভাষার অকুলান হইবে, সে স্থলে ম্লেচ্ছ ভাষা, অশিষ্ট ভাষা অশিক্ষিতের ভাষাও সাহিত্যের দরবারে স্থান পাইবে—এরণ্ডও দ্রুমত্ব প্রাপ্ত হইবে কিন্তু কেবল নিরস্ত পাদপে দেশে, যত্র তত্র নহে। তাই 'পিক নেম সত-তামরসাদি' ম্লেচ্ছশব্দ ও সংস্কৃত ভাষায় স্থান পাইয়াছে।

বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত ও কি তাহাই নহে? প্রমথ চৌধুরীও কি অতি পরিষ্কার করিয়া এই মতই প্রকাশ করেন নাই? স্বামীজী বাঁচিয়া থাকিয়া বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা দেখিলে বোধ হয় তাঁহার যুক্তিপূর্ণ মতেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিত এবং জৈমিনির সিদ্ধান্তের সহিত কোনও রূপ বিরোধ থাকিত না। মনে রাখিতে হইবে গতি বা তরঙ্গই ভাষার প্রাণ!

স্মৃতি : আচার ও ধর্ম

ভারতীয় আর্যগণের ধর্মের মূল বেদ। বেদ শব্দটিতে ১. সংহিতা ২. ব্রাহ্মণ এবং ৩. উপনিষদ্ এই তিন শ্রেণীর শাস্ত্রকে বুঝাইয়া থাকে। ধর্ম সম্বন্ধে ইহাদিগের সকলেরই সমান প্রামাণ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের মতে সংহিতাই সর্বপ্রাচীন, তাহার পর ব্রাহ্মণ, তাহার পর উপনিষদ্। সংহিতা গ্রন্থের বিষয়বস্তু যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধান। ব্রাহ্মণভাগে ঐ সকল বিধানেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণকে সংহিতারই অনুপূরক বলা যাইতে পারে। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টাতেই উপনিষদের আবির্ভাব। উপনিষদের মতে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় এবং মুক্তিই মনুষ্যের পরম ও চরম পুরুষার্থ। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের চরম পুরস্কার স্বর্গের পরম সুখ। এই তিন শ্রেণীর বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে যে একটি ক্রম পরিণতির ভাব বিদ্যমান তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

দেশ, কাল ও অবস্থা ভেদে ধর্মের পরিবর্তনের স্পৃহা হইতেই স্মৃতির উৎপত্তি। বেদ হইতে ভিন্ন নূতন কোন বিষয় স্মৃতিতে গৃহীত হইয়াছে, ইহা সনাতনপন্থী আর্যগণ স্বীকার করে না। তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস বেদবিদ্ ঋষিগণ বেদের স্মৃতি বা স্মরণ হইতেই স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। উত্তরকালের হীনবীর্য

মানব সন্ততিগণ অখিল বেদের উপদেশগুলি ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তাহাদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বেদার্থবিদ্ ক্রান্তদর্শী মন্বাদি ঋষিগণ সহজ-সরল ভাষায়, সংক্ষিপ্ত আকারে বিস্তৃত বেদের বিক্ষিপ্ত উপদেশগুলি সংকলন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই ঋষিপ্রণীত ধর্মগ্রন্থগুলিরই নাম "স্মৃতি"। স্মৃতির বিষয়বস্তু তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত – ১. আচার অধ্যায় ২. ব্যবহার অধ্যায় ও ৩. প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়। আমরা বর্তমান নিবন্ধে আচার ধর্মের ক্রমে ক্রমে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ক্রমপ্রসারের পরিণতিরূপে আর্যগণ ভারতের বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর্যগণের এই প্রসার মূল বেদেই স্বীকৃত হইয়াছে। "বৈশ্বানরাগ্নির" বিদেহ রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পূর্বাভিগমন এই ক্রমপ্রসারেরই সূচনা করিতেছে। বিভিন্ন স্থানে বাস করায় আর্যগণের লোকযাত্রাও নানা দিক্ হইতে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিল। তখন জ্ঞানী ঋষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে একইরূপ আচার ও ধর্ম সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। সমাজের এইরূপ অবস্থাতেই বিভিন্ন স্থানস্থিত মনুষ্যগণের লোকযাত্রার উপযোগী বহুবিধ স্মৃতির উদ্ভব হয়। পক্ষান্তরে, দেশের একাংশ হইতে অন্য অংশে গতায়াতের সুযোগ ও সুবিধা না থাকাতে দেশের বিভিন্ন ভাগে একই সময়ে একই প্রকারের স্মৃতির উদ্ভবের প্রয়োজন হয়। পরবর্তীকালে সকল স্মৃতিরই যে সমান প্রামাণ্য এবং সার্বজনীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, ইহাও তাহার একটি কারণ।

সংস্কারনিয়ন্ত্রিত ভারতীয় আর্যগণ প্রথমেই ধর্মবিষয়ে স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। কুমারিল ভট্ট তাঁহার তন্ত্রবার্তিকে এই সকল জনমানসের সন্দেহগুলির উল্লেখ করিয়াছেন—স্মৃতি গ্রন্থগুলি মনুষ্যকৃত, তাহারা বেদের ন্যায় নিত্যও নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। তাহাদিগের স্বতঃ প্রামাণ্য নাই। মনু প্রভৃতির রচিত স্মৃতিশাস্ত্র মনু প্রভৃতির স্মৃতি বা স্মরণশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মূল উৎসের সত্যনিষ্ঠার উপরেই তাহাদিগের স্মরণশক্তির প্রামাণ্য। সুতরাং কোনও স্মৃতিরই বেদের ন্যায় স্বতঃ প্রামাণ্য থাকিতে পারে না। কিন্তু যেহেতু বেদবিৎ শিষ্টগণের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক এই স্মৃতিগুলির প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে সুতরাং ইহাদিগকে একেবারে অপ্রামাণ্য বলিয়াও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। অতএব স্মৃতি শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

যখন আর্যগণ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিল যে, বেদে যাহা বিহিত হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহাই সরল ও সহজ ভাষায় বিহিত হইয়াছে এবং বেদবিরুদ্ধ নূতন কোনও বিষয়ই সন্নিবিষ্ট হয় নাই, কেবল তখনই তাহারা স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইল। একবার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইবার পর তাহারা ইহাকে বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করতে আরম্ভ করিল। ইহার পর তাহারা সন্দিগ্ধ স্থলে সঙ্গতি করিবার জন্য উন্মুখ হইল। যখন তাহারা দেখিল যে কোন স্মৃতিতে যাহা বিহিত হইয়াছে বেদে তাহার সমর্থন পাওয়া যায় না তখন তাহারা ইহার সঙ্গতি করিবার জন্য বলিতে লাগিল সুদীর্ঘকালের ব্যবধানের জন্য বেদের বহুশাখা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্মৃতির বচনের সমর্থক শ্রুতির লোপ হওয়াতেই স্মৃতি বচনের সমর্থক শ্রুতি পাওয়া যাইতেছে না। প্রকৃত প্রস্তাবে স্মৃতির বচনের সহিত শ্রুতি-বচনের কোনও বিরোধ নাই, থাকিতেও পারে না। যেই শ্রুতি স্মৃতি-বচনের সমর্থক ছিল, তাহা স্মৃতিকার কর্তৃক পরিজ্ঞাত ছিল। স্মৃতিকার শ্রুতিবিরুদ্ধ কোনও কথা লেখেন নাই, লিখিতেও পারেন না। সন্দিগ্ধ স্থল ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার সকলই শ্রুতির অনুকূল বা শ্রুত্যবিরুদ্ধ। সুতরাং সন্দিগ্ধ স্থলও শ্রুতি বিরুদ্ধ হইতে পারে না। অনুকূল শ্রুতি অনুমান করিয়া লইতে হইবে। স্মৃতিকারগণ বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা বেদবিরুদ্ধ কোনও বিধান করিতে পারেন না। অনুমাপক শ্রুতির সাহায্যেই এই সকল সন্দিগ্ধ স্থলে সন্দেহের নিরসন করিতে হইবে।

পরবর্তী কালে পণ্ডিতগণ ইতিহাস পুরাণ, ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র শ্রৌত্রসূত্র, এবং বিংশতি, অষ্টাবিংশতি, ষট্‌ত্রিংশত বা অষ্টচত্বারিংশত্ সংহিতাকেই স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কুমারিল ভট্ট তাঁহার তন্ত্রবার্তিকে ইহাদিগের মধ্যে প্রামাণ্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ কল্পনা করিয়াছেন। তিনি ইতিহাস, পুরাণ এবং মনুস্মৃতিকে সমগ্র আর্যাবর্তে প্রমাণ বলিয়া স্বীকর করিয়াছেন। অন্যান্য স্মৃতিগুলির দেশ বা সম্প্রদায় বা যুগভেদেই প্রামাণ্য সীমায়িত। ইহাদিগের সার্বজনীন প্রামাণ্য নাই। কুমারিল ভট্টের অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু প্রত্যেক স্মৃতিই নিত্য এবং অপৌরুষেয় বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সকল স্মৃতিরই প্রামাণ্য সার্বজনীন। তবে সে দেশ, যুগ বা সম্প্রদায়ভেদে স্মৃতির প্রামাণ্য সীমায়িত করা হইয়াছে, তাহার কারণ সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক স্মৃতি বিশেষের প্রামাণ্যের স্বীকৃতি দান। অবস্থা বৈচিত্র্যে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জনগণ

কোনও বিশেষ স্মৃতির বিধানগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিপালিত করিতে সমর্থ। সকলের পক্ষে তাহা সম্পাদন করা সহজও নহে, সম্ভবও নহে।

ইহা সত্য যে স্মৃতিগুলির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পার্থক্যের মূলে রহিয়াছে দেশ, কাল ও অবস্থা ভেদে নূতনকে গ্রহণ করিয়া স্বীকরণের স্পৃহা বা প্রবণতা। এই স্পৃহার প্রভাবে ইহাই স্বাভাবিক যে, দেশ বিশেষে বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে সংগৃহীত স্মৃতিবিশেষ ভিন্ন দেশস্থ অবস্থাবিশেষের মধ্যে সংকলিত স্মৃতিবিশেষ হইতে পৃথক্ হইবে।

প্রায় প্রত্যেক ধর্ম সংহিতাতেই একটি করিয়া আপদ্ধর্ম প্রকরণ রহিয়াছে। ইহা হইতেও এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, স্মৃতিকারগণ অবস্থাবিশেষে, বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নূতনকে স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ করেন নাই।

সময়ের পরিবর্তনে ক্রমে ক্রমে স্মৃতির বিধানের প্রতি জনগণের আর পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রহিল না। তাহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষিগণের নিকট হইতে সন্দিগ্ধ স্থলে 'সদাচার' কিরূপ তাহাই জানিতে চাহিল। সাধু ব্যক্তিগণের আচারই সদাচার। পূর্বপূর্ব সাধু ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে তাহারা স্মৃতিবচন অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য দিতে চাহিল, কিন্তু সাধুগণের আচারে ও শ্রুত্যুক্ত বা স্মৃতি বিহিত ধর্মের অতিক্রম দেখিতে পাইল—১. প্রজাপতি তাঁহার নিজকন্যার পশ্চাদ্ধাবনা করিয়াছিলেন। ২. ইন্দ্র অহল্যার জার ছিলেন। ৩ শতপুত্রের মৃত্যুতে শোকান্ধ বশিষ্ঠ আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ৪. ভীষ্ম, ক্ষত্রিয় হইয়াও বর্ণধর্ম অতিক্রম করিয়া আমরণ ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিয়াছিলেন ৫. যুধিষ্ঠির তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন কর্তৃক জিত দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণাচার্যের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য 'অশ্বত্থামা হত' এই বাচনিক সত্যের মাধ্যমে মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ৬. মথুরা এবং অহিচ্ছত্রের ব্রাহ্মণ রমণীগণ সুরাপানাসক্ত। ৭. উত্তর দেশীয় ব্রাহ্মণগণ সিংহ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ এবং উষ্ট্রের দান প্রতিগ্রহ এবং ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে এবং তাহার ইহাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহার পর তাঁহারা সন্দিগ্ধ স্থলে সঙ্গতি করিবার জন্য উন্মুখ হইল। যখন তাহারা দেখিল যে কোন স্মৃতিতে যাহা বিহিত হইয়াছে বেদে তাহার সমর্থন পাওয়া যায় না তখন তাহারা ইহার সঙ্গতি করিবার জন্য বলিতে লাগিল সুদীর্ঘকালের ব্যবধানের জন্য বেদের বহুশাখা

লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উল্লেখযোগ্য, উত্তরদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের স্ত্রী, শিশু ও বন্ধুগণের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন। ৮. দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্যা পরিণয় এবং উচ্চাসনে বসিয়া আহার সদাচার রূপে পরিগৃহীত। ৯. দাক্ষিণাত্যে এবং উত্তর প্রদেশে বন্ধু ও আত্মীয়গণের উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং সকল বর্ণের স্পৃষ্ট তাম্বুল গ্রহণ সদাচার রূপে পরিগৃহীত। তাহারা ভোজনান্তে মুখপ্রক্ষালন করে না এবং রজকগৃহ হইতে আনীত ধৌতবস্ত্র পুনরায় ধৌত না করিয়াই পরিধান করে। ১০. উৎকলে দেবর পতি, নেপালে মহিষভক্ষণ এবং গৌড়ে মৎস্য ভক্ষণ সদাচাররূপেই পরিগৃহীত। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধুগণের আচারকেই বা কিরূপে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ?

ইহার উত্তরে আপস্তম্ব বলিলেন, প্রাচীনগণের এই ধর্মব্যতিক্রমকে দূষণীয় বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ, প্রাচীনগণ ছিলেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। জনসাধারণ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নহে, সুতরাং তাহারা এই সকল ধর্মাতিক্রমের অনুসরণ করিবে না।

কুমারিল ভট্ট নূতনভাবে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রজাপতির স্বীয় দুহিতার পশ্চাদ্ধাবনকে তিনি সূর্যের উষার অনুগমন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রজাপতি শব্দের অর্থ, যে সকলকে রক্ষা বা পালন করে, অর্থাৎ সূর্য। ইহা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা যে, রাত্রির শেষ ভাগের দিগে সূর্য উষাকে স্পর্শ করে। সূর্য হইতেই উষার উন্মেষ। সুতরাং উষা সূর্যের কন্যা স্থানীয়। তাঁহার মতে সূর্যের উষায় অনুগমনকেই প্রজাপতির স্বীয় দুহিতার পশ্চাদ্ধাবন্ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইন্দ্র শব্দের যৌগিক অর্থ দ্যুতিমান। ইহা সূর্যেরই নামান্তরমাত্র। অহল্যা শব্দের অর্থ, যাহা দিবাভাগে অন্তর্হিত বা অদৃশ্য থাকে। সুতরাং অহল্যা শব্দের অর্থ রাত্রি। জার শব্দের যৌগিক অর্থ, যে জীর্ণ বা ধ্বংস করে। 'অহল্যার জার' ইহার অর্থ যে রাত্রির অন্ধকারকে ধ্বংস করে, অর্থাৎ সূর্য।

পিতৃভক্তির আতিশয্যের জন্যই ভীষ্ম প্রচলিত ধর্মের অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহা নিন্দিত হইতে পারে না। যজ্ঞবেদী সম্ভূতা দ্রৌপদী সাধারণ রমণী নহেন। তিনি ছিলেন ধনদাত্রী লক্ষ্মীর অবতার। সুতরাং বহুভোগ্যা, অথবা, পাঁচটি সমরূপযৌবনসম্পন্না, সমগুণবতী রমণীকেই একটি সাধারণ নাম দ্রৌপদী বলিয়া

—৩

অভিহিত করা হইয়া থাকিবে। একটি দ্রৌপদী নামে রমণী পঞ্চভ্রাতা কর্তৃক ভুক্তা হন নাই অথবা দ্রৌপদীই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র অর্জুনের পত্নী ছিলেন। মহাভারতকার পাণ্ডবগণের মধ্যে অসাধারণ সৌভ্রাত্র্য দেখাইবার জন্যই পঞ্চপাণ্ডবের একমাত্র পত্নীরূপে দ্রৌপদীকে বর্ণনা করিয়াছেন।

দেশভেদে বা যুগভেদে যে সকল ধর্মাতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাধুগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও, যদি প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রুতি বা স্মৃতিবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্মবিষয়ে তাহা কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। সদাচারের প্রামাণ্য বিষয়ে কুমারিলের সিদ্ধান্ত এইরূপ—সাধুগণের আচরণ রাগদ্বেষাদি বিহীন হইলে তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহার কারণ কোনও সাধু বিদ্বান ব্যক্তির আচরণ লোভ বা দ্বেষ প্রণোদিত না হইলে অবশ্যই বেদমূলক হইবে। বেদমূলক হইলেই তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। সাধুগণ কেবল রাগদ্বেষের অধীন হইয়াই বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারেন। রাগদ্বেষ না থাকিলে কখনই তাহারা বেদবিরোধী হইবেন না।

এই আলোচনা হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সাধুদিগের আচারমাত্র 'সদাচার' নহে। সাধুগণ যাহা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রশংসা করেন, তাহাই ধর্ম। আচারটি সৎ হইলেই তাহা সদাচার হয়। সদ্ব্যক্তিগণের আচার হইলেই তাহা সদাচার হয় না।

ইহার পর ক্রমে ক্রমে সাধারণমানুষের অন্তঃকরণও ধর্মবিষয়ে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি লাভ করিল। অবশ্য নিবন্ধকারগণ শাস্ত্রানুমোদিত বৈকল্পিক বিষয়ে জনগণের আত্মতুষ্টিকে ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

নিবন্ধের যুগে আমরা দেখতে পাই যে, নিবন্ধকারগণ বিনা দ্বিধা ও সঙ্কোচে স্মৃতি এমন কি শ্রুতির প্রামাণ্যও অস্বীকার করিতেছেন। বেদ বলিতেছেন—যে বেদজ্ঞ নহে সে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। এই পরমাত্মার স্বরূপ কেবল উপনিষদ্ গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। নিবন্ধকারগণের মতে শূদ্র বেদাধ্যয়নে অনধিকারী। তাহা হইলে শূদ্রের মুক্তি কিরূপে হইবে? পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তো মুক্তি লাভ ঘটিতে পারে না? নিবন্ধকার বীরমিত্রোদয় নিবন্ধে ঘোষণা করিলেন যে শূদ্র পুরাণ হইতেই পরমাত্মার স্বরূপ জানিতে পারিবে। শূদ্রের পুরাণাধ্যয়নে কোনও বাধা নাই। বেদ বলিলেন—কেবল বেদ হইতেই পরমাত্মার স্বরূপ জানিতে পারা যায়। নিবন্ধকার

বলিলেন, পুরাণ হইতেও পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ইহা প্রত্যক্ষভাবেই বেদবিরোধিতা।

সময়ের পরিবর্তনে ধর্মবিষয়ে প্রামাণ্য ক্রমে ক্রমে কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমে অপৌরুষেয় এবং নিত্য বেদই ধর্মবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর কালক্রমে আসিল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনুষ্যরচিত স্মৃতিগ্রন্থ। আরও পরবর্তী কালে সদাচার হইল ধর্মবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। মীমাংসক জৈমিনির সময় পর্যন্ত বেদেরই ছিল ধর্মবিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য। তাহার পর স্মৃতির, তাহার পর সদাচারের। ইহার অর্থ এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই বলবান এবং স্মৃতি ও সদাচারের বিরোধে স্মৃতিই বলবান। শবরস্বামীর সময় পর্যন্ত এই নিয়মই নির্দিষ্ট ছিল।

কুমারিল ভট্টের সময়ে ইহার পরিবর্তন ঘটে। তাঁহার মতে প্রামাণ্য বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। স্মৃতিও শ্রুতির ন্যায়ই সমান বলবান। উহারা উভয়েই তুল্যবলবিশিষ্ট। স্মৃতির সহিত শ্রুতির কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। যেহেতু স্মৃতিতে শ্রুতির অতিরিক্ত অভিনব কোনও বিষয় সন্নিবেশিত হয় নাই, সুতরাং স্মৃতিবাক্যকেও শ্রুতিবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং শ্রুতি ও স্মৃতির আপাতবিরোধকে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ বলিয়াই গণ্য করিতেই হইবে। শ্রুতি এবং স্মৃতির মধ্যে কোনটিই কোনটি অপেক্ষা সবল বা দুর্বল নহে। স্মৃতিকে শ্রুতি অপেক্ষা হীন বা অপকৃষ্ট মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

কুমারিলের সময়ে স্মৃতি বেদেরই সমান প্রামাণ্যলাভ করে। স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য আর স্বীকৃত হয় না।

ইহার পরবর্তী স্তরে নিবন্ধ গ্রন্থগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। নিবন্ধকারগণ শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির উপরেই অধিক প্রাধান্য আরোপ করিযাছেন। ইহার কারণ শ্রুতিগুলি অতি প্রাচীন, অপ্রচলিত দুর্বোধ্য ভাষায় নিবদ্ধ, সহজলভ্যও নহে। পক্ষান্তরে স্মৃতিগুলি সহজলভ্য, সহজবোধ্য এবং সহজে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। এই সকল কারণেই নিবন্ধকারগণ শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতিকে অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন। ধর্মের বিপরিবর্তনও ইহার অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে। এইরূপে ধর্মবিষয়ে প্রামাণ্যের গুরুত্ব শ্রুতি হইতে স্মৃতিতে স্থানান্তরিত হয়।

কতকগুলি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ কলির্বর্জ্য প্রকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কলির্বর্জ্য প্রকরণ অনুসারে অগ্নিহোত্র, সন্ন্যাস প্রভৃতি কলিযুগে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। মূলবেদে কিন্তু নিষিদ্ধ করা তো দূরের কথা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতির বিশেষ প্রশংসাই করা হইয়াছে। বীরমিত্রোদয়কার কোনওরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—ঐ সকল অনুষ্ঠানের জন্য বেদে যে প্রত্যক্ষবিধি রহিয়াছে তাহা স্মৃতিবচনের দ্বারা বাধিত হইবে। পূর্বে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতি-বচনের দ্বারাই স্মৃতিবচন বাধিত হইত। নিবন্ধকারগণের হস্তে এই ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইল। স্মৃতিবচনের দ্বারাই শ্রুতিবচন বাধিত হইতে লাগিল।

আরও পরবর্তীকালে দেখা যায় যে দেশাচারের প্রামাণ্য শ্রুতির সহিত সমান এবং স্থলবিশেষে শ্রুতিস্মৃতি অপেক্ষাও আচারেরই প্রামাণ্য ও প্রাধান্য অধিক। কৃত্যচিন্তামণিকার বলিলেন—'দেশাচারস্তাবৎ আদৌ বিচিন্ত্য দেশে দেশে যা স্থিতিঃ সৈব কার্য্যা'—প্রথমেই দেশাচারের কথা চিন্তা করিতে হইবে। ধর্মবিষয়ে যেই দেশে যেই আচার প্রচলিত সেই দেশে সেই আচারেরই প্রামাণ্য ও প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক।

কুমারিলের সময় পর্যন্ত কিন্তু দেশাচারের প্রামাণ্য অতি সামান্যই ছিল। শ্রুতি ও স্মৃতির অভাবেই সদাচারের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইত। শ্রুতি এবং স্মৃতি অপেক্ষা আচারের প্রামাণ্য দুর্বল বলিয়াই ইহার স্থান সর্বনিম্নে ছিল। নিবন্ধ-কারদিগের সময়ে দেশাচারের প্রামাণ্য সর্বোপরি স্থাপিত হইল।

নিবন্ধের যুগে ধর্মবিচারে নিবন্ধেরই একমাত্র প্রামাণ্য। মূল স্মৃতি বা শ্রুতি কি বলিতেছে তাহা লইয়া আর মস্তিষ্ক সঞ্চালনের প্রয়োজন রহিল না। নিবন্ধ-কারদিগের মতের সহিত কোনও শ্রুতি বা স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে নিবন্ধকারগণের মতই প্রামাণ্য ও প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। যদি কোনও শ্রুতি বা স্মৃতিবচন একজনও নিবন্ধকার কর্তৃক কোনও প্রসঙ্গে উদ্ধৃত না হইয়া থাকে তবে সেই শ্রুতি বা স্মৃতিবচন নির্মূল বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইতে লাগিল।

এইরূপে দেখা যায় যে ধর্মবিষয়ে প্রামাণ্যের গুরুত্ব প্রথমে একমাত্র শ্রুতিতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। ক্রমে তাহা শ্রুতি হইতে স্মৃতিতে, স্মৃতি হইতে সদাচারে এবং পরিশেষে অর্বাচীন নিবন্ধকারগণের গ্রন্থে দেশাচারে কেন্দ্রীভূত হয়।

এই আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্মবিচারে ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে

সর্বকালেই একটি গতিশীল চলিষ্ণু শক্তি কার্য করিয়া গিয়াছে। ইহা কোনও কালেই এক নির্দিষ্ট স্থানে স্থির বা অচল হইয়া অবস্থান করে নাই। এইজন্যই ঋষি পরাশর বলিয়াছেন—সত্যযুগে যাহা ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ত্রেতা ও দ্বাপর হইতে পৃথক, যাহা ত্রেতা ও দ্বাপরের জন্য বিহিত হইয়াছে কলিযুগের ধর্ম তাহা হইতেও পৃথক। প্রতিযুগের ধর্ম সেই যুগের উপযোগী ও অনুরূপভাবেই নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন—'যুগে যুগে চ যে ধর্মাস্তেষু তেষু চ যে স্থিতাঃ। তেষাং নিন্দা না কর্তব্য যুগরূপা হিতে দ্বিজাঃ॥'—যুগভেদে যেই ধর্ম যেই যুগের জন্য বিহিত হইয়াছে তাহা যেই ব্রাহ্মণ সেই যুগে প্রযুক্ত ধর্ম বলিয়া প্রতিপালন করে, অধার্মিক বলিয়া তাহাকে নিন্দা করিবে না। কারণ সেই ব্রাহ্মণ সেই যুগের মূর্ত বিগ্রহ।

কিন্তু ইহার পরও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। মনুর মতে যাঁহারা যুক্তি বলে শ্রুতি বা স্মৃতিবচনের প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করে তাঁহারা নাস্তিক পদবাচ্য। যে সকল নিবন্ধকার শ্রুতিবচনের বিরোধিতা করিয়া অভিনব সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন তাঁহাদিগকেও কি নব্যনাস্তিক বলা যাইবে না? মনু কিন্তু নাস্তিকগণকে সজ্জনসমাজ হইতে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়াছেন।

নানা মুনির নানা মত

নিবন্ধকার স্মার্ত রঘুনন্দন বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কলিকালের জন্য কতকগুলি অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়াছেন—যথা, সমুদ্রে গমন, কমণ্ডলুধারণ, অসবর্ণ বিবাহ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথিপূজায় পশুহত্যা, শ্রাদ্ধের জন্য মাংস আহরণ, অরণ্যাশ্রমে গমন, দত্তা কন্যার পুনর্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যব্রত পালন, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, মরণের উদ্দেশ্যে হিমালয় প্রভৃতি পর্বতে আরোহণ, গোমেধ যজ্ঞ। আদিত্যপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানকে কলিকালের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন—যথা, আততায়ী দ্বিজাগ্রগণের ধর্মযুদ্ধে হিংসা, যথাবিধি বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ, বৃত্ত এবং স্বাধ্যায়সাপেক্ষ অঘসঙ্কোচ, বিপ্রগণের মরণান্তক প্রায়শ্চিত্ত বিধান, পাপবিষয়ে সংসর্গদোষ, মধুপর্কের জন্য পশুবধ, শূদ্রগণের মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র এবং অর্ধসীরীগণের ভোজ্যান্নতা, গৃহস্থের পক্ষে অতি দূরবর্তী স্থানে তীর্থসেবা, ব্রাহ্মণাদির জন্য শূদ্রের পক্বতাদিক্রিয়া, ভৃগুপতন, অগ্নিপতন এবং বৃদ্ধাদির মরণবিধান প্রভৃতি। পুরাণকার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান কলি ভিন্ন অন্যযুগে ধর্ম বলিয়া গণ্য হইলেও কলির আদিতে মহর্ষিগণ লোকগুপ্তির জন্যই ইহাদিগকে কলিকালের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মীমাংসকগণ কিন্তু দেশভেদে বা যুগভেদে ধর্মভেদব্যবস্থা স্বীকার করেন নাই। পূর্বমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম অধিকরণকে 'হোলাকাধিকরণ' বলা হয়। এই অধিকরণের পূর্বপক্ষে বলা হইয়াছে—হোলাকাদি শিষ্টাচার ও হারীতাদি স্মৃতিবিশেষের প্রামাণ্য অনুষ্ঠাতৃ পুরুষভেদে ব্যবস্থিত। কারণ, দেশ বিশেষেই তাহা দৃষ্ট হয়। হোলাকাদির অনুষ্ঠান প্রাচ্যদেশীয়গণই করিয়া থাকেন। বসন্ত উৎসবের নাম হোলাকা। আহ্নীনৈবুকাদি দাক্ষিণাত্যগণ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্ব-স্ব কুলাগত করঞ্জার্কাদি স্থাবর দেবতা পূজাদির নাম আহ্নীনৈবুক। উদ্‌বৃষভযজ্ঞাদি উদীচ্যদেশীয়গণ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বলীবর্দগণকে অভ্যর্চনা করিয়া প্রধাবিত করার নাম উদ্‌বৃষভযজ্ঞ। এইরূপ হারীতাদি স্মৃতিও দেশবিশেষেই অনুসৃত হইয়া থাকে। এইগুলি দেশাচার। সুতরাং ইহাদিগের প্রামাণ্য দেশবিশেষেই ব্যবস্থিত।

সিদ্ধান্তে মাধবাচার্য তাঁহার 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা' বিস্তরে বলিলেন—'মৈবম্' —না, তাহা নহে। অর্থাৎ হোলাকাদি আচাবের প্রামাণ্য দেশ বিশেষে ব্যবস্থিত নহে। ইহাদিগেব মূলরূপে অনুমিত শ্রুতিব সর্বসাধারণত্ব হেতু ইহাদিগেরও সর্বসাধারণত্বই প্রতিপন্ন হয়। আচারের দেশভেদ বা যুগভেদব্যবস্থা স্বীকার্য নহে। যদি কোনও আচার ধর্ম হয়, তাহা হইলে সকল দেশে সকল যুগেই তাহা ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে। দেশভেদে বা যুগভেদে দেশবিশেষে বা যুগবিশেষে ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম এইরূপ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে "যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥" এই মনুবচনে তো মনু দেশবিশেষেই আচারের ধর্মত্ব নিরূপণ করিয়াছেন? মীমাংসকগণ ইহার উত্তরে বলিলেন যে, শ্রুতি বা স্মৃতিবিরুদ্ধ কোনও আচার কখনও ধর্মরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। শ্রুতি এবং স্মৃতির অবিরুদ্ধ আচারই ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হয়। শ্রুতি এবং স্মৃতির অবিরুদ্ধ দুইটি বিভিন্ন আচার যদি দুইটি দেশের মধ্যে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে কোনটি কে আচরণ করিবে মনুবচনে এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যদি দুইটি আচারই শ্রুতি বা স্মৃতিমূলক হয়, তাহা হইলে 'শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্রস্যাৎ তত্র ধর্মাবুভৌ স্মৃতৌ' এই নিয়ম অনুসারে বিকল্প বিধান করিতে হইবে। উভয় আচারই ধর্মরূপে পরিগৃহীত হইবে।

কিন্তু কে কোন্ আচার গ্রহণ করিবে এই প্রশ্নের উত্তরেই মনু বিকল্পিত আচারদ্বয়ের মধ্যে দেশভেদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ মাতুলকন্যার পরিণয়, বিধবাবিবাহ, দিবাবিবাহ, সমুদ্রযাত্রাস্বীকার প্রভৃতি দেশভেদে এবং যুগভেদে ব্যবস্থিত আচারগুলি যদি শ্রুতিস্মৃত্যনুমোদিত হয়, তাহা হইলেই তাহা সদাচাররূপে গণ্য হইয়া ধর্মরূপে সর্বদেশে ও সর্বকালে পরিগৃহীত হইবার যোগ্য হইবে। কিন্তু তাহাদিগের অনুষ্ঠান দেশভেদে ও যুগভেদে ব্যবস্থিত হইবে। পক্ষান্তরে, ঐ সকল আচারের মধ্যে যদি কোনটি শ্রুতি-স্মৃতির দ্বারা অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে দেশবিশেষের বিশিষ্টগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও কোন যুগে বা কোন দেশেই তাহা ধর্ম বলিয়া গণ্য হইবে না। শ্রুতিস্মৃত্যনুমোদিত আচারই সদাচার। কেবলমাত্র সজ্জনগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেই তাহা সদাচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু সদাচারমাত্রই সর্বকালে ও সর্বদেশে সকল পুরুষের পক্ষে আচরণীয় ধর্ম হয় না। যেই সদাচার যেই দেশের জন্য যেই যুগের জন্য এবং যেই পুরুষের জন্য বিহিত হইয়াছে তাহাকেই সেই দেশের, সেই যুগের, সেই পুরুষের প্রতিপাল্য ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। 'অসৎ' অর্থাৎ শ্রুতি বা স্মৃতি কর্তৃক অননুমোদিত আচার কোনও যুগে, কোনও দেশে কোনও পুরুষের পক্ষেই ধর্মরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। হোলাকাদি অনুষ্ঠান শ্রুতিস্মৃত্যাদির দ্বারা অনুমোদিত হওয়াতে সদাচাররূপেই গণ্য এবং সর্বদেশে সর্বকালে সকল পুরুষের পক্ষেই ধর্মরূপে পরিগৃহীত হইলেও দেশভেদেই তাহা ব্যবস্থিত হইবে। ইহাই মনুবচনের অভিপ্রায়।

শিষ্টাচার শ্রুতি বা স্মৃতিবিরুদ্ধ হইলে তাহা সদাচার বলিয়া ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ হয় না। দক্ষিণদেশের কোনও কোনও স্থানে শিষ্টগণ মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকেন। হোলাকাদি আচারের ন্যায় শিষ্টগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়াতে মাতুলকন্যা পরিণয়রূপ আচারও শিষ্টাচারত্ব হেতু ধর্মে প্রমাণ হইবে কি না মীমাংসকগণ (পু. মী. অধ্যায় ১ পাদ ৩ অধিকরণ ৫) এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বার্তিককার বলিলেন—না, যেহেতু ইহা স্মৃতিবিরুদ্ধ সুতরাং ইহা সদাচার বলিয়া ধর্মে প্রমাণ হইতে পারে না। স্মৃতি বলিতেছেন—'মাতুলস্য সুতাম্ ঊঢ্বা মাতৃগোত্রাং চ তথৈবচ। সমান প্রবরাং চৈব ত্যক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥' মাতুলের কন্যা মাতৃগোত্রা এবং সমান প্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান করিবে—এই স্মৃতিবচন প্রত্যক্ষভাবেই মাতুলকন্যাকে বিবাহ

কন্যা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। দাক্ষিণাত্যশিষ্টগণের আচার এই স্মৃতির অনুকূল নহে।

স্মৃতি ও আচার উভয়েরই মূল অনুমাপক শ্রুতি। সুতরাং স্মৃতিও আচার উভয়েই সমান বলবান এবং তুল্যবলবিরোধে উভয়ই ধর্ম এইরূপ আশঙ্কা করিয়াও মাতুলকন্যা পরিণয়কে ধর্ম বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ, হোলাকাদি সদাচারে মন্বাদি স্মৃতিকারগণের অনুমাপকত্ব বর্তমান রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শিষ্টাচারে তাহা নাই। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে দেশ, কাল বিপ্রকৃষ্ট বেদকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে সমর্থ ছিলেন। ইদানীন্তন দাক্ষিণাত্যশিষ্টগণ বেদ বা শ্রুতিকে সেইরূপভাবে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ নহেন। সেইজন্য এই সকল শিষ্টাচার মূল শ্রুতিকে অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু যে কোনও শিষ্ট, যে কোনও দেশবিশেষে বা কালবিশেষে হোলাকাদি আচারের মূলীভূত যে কোনও স্মৃতিগ্রন্থ প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করিতে সমর্থ। সুতরাং শিষ্টাচারের দ্বারা স্মৃতিই অনুমান করিতে পারা যায়, শ্রুতি নহে। আবার প্রত্যক্ষ স্মৃতির দ্বারা অনুমিত স্মৃতি বাধিত হয়। এইকারণেই দাক্ষিণাত্য শিষ্টাচারের অনুকূল কোনও স্মৃতিও অনুমিত হইতে পারে না।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন আচার হইতে স্মৃতি জানিয়া, স্মৃতি হইতে শ্রুতি কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং আচার হইতে শ্রুতি প্রত্যক্ষভাবে কল্পনা করিতে পারা যায় না। স্মৃতির মাধ্যমেই তাহা করিতে হয়—ইহা ব্যবহিত। আচার বিষয়ে শ্রুতির প্রামাণ্য বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্তী। স্মৃতিবিরুদ্ধ এইরূপ আচারের ধর্মবিষয়ে প্রামাণ্য থাকিতে পারে না—'আচারাত্তু স্মৃতিং জ্ঞাত্বা স্মৃতেশ্চ শ্রুতি কল্পনম্। তেন ব্যবহিতং তেষাং প্রামাণ্যং বিপ্রকৃষ্যতে॥'—আচারের মূল স্মৃতি। সুতরাং শ্রুতিমূলক হইলেই স্মৃতির প্রামাণ্য। ইহাই হইল মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। এই মীমাংসকগণ দেশভেদে যদি কোনও শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ আচার তদ্দেশীয় শিষ্টগণ কর্তৃক আচারিতও হয় তথাপি তাহাকে অসদাচার এবং অধর্ম বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি বা শ্রুত্যনুমোদিত সদাচারকে সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বপুরুষের জন্য ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াও যুগভেদে, দেশভেদে এবং পুরুষভেদে উহাদিগের ব্যবস্থিতত্বই স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বীকৃতির দ্বারা তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে আচার ধর্মের ক্রমপরিবর্তনশীলতাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

জৈমিনি শবরস্বামী এবং কুমারিল ভট্ট পর্যন্ত মীমাংসকগণ আচারের এই হীনবলত্বই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। নিবন্ধকারগণ কিন্তু শ্রুতি বা স্মৃতি অপেক্ষা আচারকেই অধিক প্রামাণ্য ও প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে—ধর্মবিচারে প্রথমে দেশাচারের কথাই চিন্তা করিতে হইবে। যেই দেশে যেই আচার পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহা অসদাচার অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে শ্রুতি বা স্মৃতিবিরুদ্ধ হইলেও শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা, বিরূপ ব্যাখ্যা বা অঙ্গবৈকল্য ঘটাইয়াও দেশাচারের অনুকূল ব্যাখ্যার দ্বারা তাহাকে সদাচার সুতরাং ধর্ম বলিয়াই তাঁহারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে মাধবাচার্য তাঁহার পরাশরভাষ্যে মাতুলকন্যা পরিণয়কে সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিনব বিচারপদ্ধতির অবতারণা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

সংহিতাকার মনু বিবাহযোগ্যা কন্যার আলোচনাবসরে বলিলেন—

'অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে॥' ম. ৩-৫

অর্থাৎ যেই কন্যা মাতার অসপিণ্ডা এবং অসগোত্রা এবং যেই কন্যা পিতার অসগোত্রা ও চকার বলে অসপিণ্ডা সেই কন্যা মিথুনসাধ্য দারকর্মে দ্বিজাতির পক্ষে প্রশস্ত অর্থাৎ সেইরূপ কন্যাই দ্বিজাতির পরিণেয়।

যদি বল এইরূপ ব্যাখ্যায় মাতৃগ্রহণ অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ পিতৃগোত্র এবং পিতৃসাপিণ্ড নিষেধের দ্বারাই মাতৃগোত্র এবং মাতৃসাপিণ্ড নিষেধ সিদ্ধ হয়, যেহেতু মাতার পৃথক্ সাপিণ্ড বা গোত্রের অস্তিত্ব শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন নাই। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—'একত্বং সা গতা ভর্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে। স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে॥' বিবাহের সপ্তপদীগমন অনুষ্ঠানের পর নারী স্বগোত্র অর্থাৎ পিতৃগোত্র হইতে বিচ্যুত হয়। তখন সে ভর্তার গোত্র এবং সাপিণ্ডের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পিতার গোত্র এবং সাপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর গোত্র এবং সাপিণ্ড লাভ করে। সুতরাং মাতার গোত্র এবং সাপিণ্ড পিতার গোত্র এবং সাপিণ্ড হইতে পৃথক হইতে পারে না। সুতরাং যদি বল মনুবচনে মাতৃগ্রহণ নিরর্থক হইয়াছে তাহা হইলে বলিব গান্ধর্বাদি বিবাহে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং ঐ

সকল বিবাহে কন্যার পিতৃগোত্র এবং পিতৃসাপিণ্ডের নিবৃত্তিও ঘটেনা। ব্রাহ্মাদি বিবাহপদ্ধতি অনুসারে যেই কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হয় তাহার পিণ্ডোদক-ক্রিয়া ভর্তৃগোত্রানুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গান্ধর্বাদি বিবাহের পদ্ধতি অনুসারে যেই কন্যার বিবাহ হয় তাহার পিণ্ডোদক ক্রিয়া পিতৃগোত্রানুসারেই করিতে হইবে, ইহাই পুরাণ-শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, গোড়ুর পুরাণ ২।২৬।২১, ২২)।

ইহার দ্বারা মাতুলসুতা বিবাহবিষয়ে যে বিবাদ রহিয়াছে তাহাও পরাস্ত-হইল। মাতুলসুতা বিবাহের নিষেধবচনগুলি গান্ধর্বাদি বিবাহ বিষয়েই প্রযোজ্য। কারণ সেই স্থলে গান্ধর্বাদি বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহিতা কন্যার পিতৃসাপিণ্ড নিবৃত্তি ঘটে।

শাতাতপ বলিলেন—'মাতুলস্য সুতামূঢ়্বা মাতৃগোত্রাং তথৈব চ। সমান প্রবরাংচৈব দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥' মাতুলসুতা, মাতৃগোত্রা অথবা সমান প্রবরা কন্যাকে দৈবাৎ বিবাহ করিলে দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। পিতা বা মাতার ভগিনীর কন্যা এবং মাতুলসুতা ধর্মতঃ ভগিনীতুল্যাই। সুতরাং বিবাহ ব্যাপারে তাহাদিগকে বর্জন করিবে—ইহাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়। সুমন্তু বলিলেন—পিতার পত্নীগণ সকলেই মাতৃস্বরূপা। সুতরাং তাহাদিগের ভ্রাতারা সকলেই মাতুলতুল্য। তাহাদিগের ভগিনীগণ সকলেই ভগিনীতুল্যা। তাহাদিগের অপত্যগণ সকলেই ভাগিনেয়। ব্যাস বলিলেন—বিবাহ ব্যাপারে মাতৃসপিণ্ডাকে দ্বিজগণ যত্নের সহিত বর্জন করিবে। মাধবাচার্যের মতে এই সকল নিষেধবচনই গান্ধর্বাদি বিবাহবিষয়ে প্রযোজ্য। ব্রাহ্মাদি বিবাহ বিষয়ে নহে।

যদি জিজ্ঞাসা কর যে এই সকল বচনই তো শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক অবিশেষভাবে সকল পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত কন্যার বিষয়েই নহে। অবিশেষে প্রবৃত্ত এই সকল বচনকে কেবল গান্ধর্বাদি বিষয়বিশেষে কিরূপে ব্যবস্থিত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে বলিব—মনু তাঁহার সংহিতায় একাদশ অধ্যায়ের ১৭১ ও ১৭২ শ্লোকে অবিশেষে নিষিদ্ধবিষয়কে বিষয়বিশেষে উপসংহৃত বা ব্যবস্থিত করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে ব্রাহ্মাদি বিবাহবিষয়ে যদি মাতুলসুতার বিবাহ বিহিত-হয় তাহা হইলে মাতার ভগিনীর কন্যাও বিবাহযোগ্যা হইবে—এইরূপ-

প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শিষ্টগর্হিত বলিয়াই সেই স্থলে নিষেধস্মৃতি কল্পনা করিতে হইবে। শিষ্টগর্হিত বিষয়ের অনুপাদেয়ত্ব বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন -'অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্ম্যমপ্যাচরেন্নতু (১।১৫৬)।' অস্বর্গ্য এবং লোকবিদ্বিষ্ট আচার ধর্ম অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃত্যনুমোদিত হইলেও আচরণীয় নহে। যদিও মাতুলসুতা পরিণয় উদীচ্যশিষ্টগর্হিত তথাপি দাক্ষিণাত্যশিষ্টগণ কর্তৃক আচরিত হওয়াতে এবং দাক্ষিণাত্যগণের এই আচারের মূলে রাগদ্বেষাদি দোষ না থাকাতে এবং বিধি নিষেধ পরীক্ষকগণের দ্বারাই ইহা অনুষ্ঠিত হওয়াতে ইহাকে সদাচারমূলক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এই সদাচারের স্মৃতিবচনের সহিতও কোনও বিরোধ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা ধর্ম ও অনুষ্ঠেয়। কিন্তু মাতার ভগিনীর কন্যা বিবাহ অবিগীত শিষ্টাচারের দ্বারা গর্হিত। সুতরাং তাহা ধর্মও নহে—অনুষ্ঠেয়ও নহে।

মাতুলসুতা বিবাহের অনুগ্রাহক শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়—

"আয়াহীন্দ্র পথিভিরীড়ি তেভিঃ
যজ্ঞমিমং নো ভাগধেয়ং জুষস্ব।
তৃপ্তাং জহুর্মাতুলস্যেব যোষা
ভাগস্তে পৈতৃষ্ব সেয়ী বপামিব ॥

(ঋ. স. ৭. ৪. ৩. ২২. ৬)

ইহার অর্থ—'হে ইন্দ্র তুমি স্তুতগণের সহিত আমাদিগের যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিয়া আমাদিগকর্তৃক প্রদত্ত ভাগধেয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ কর। আজ্যাদি দ্বারা সংস্কৃত বপা তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ত্যাগ করা হইয়াছে। যেরূপ মাতুলের কন্যা ভাগিনেয়েরই ভাগ অর্থাৎ ভাগিনেয় কর্তৃকই ভজনীয়া অর্থাৎ ভাগিনেয়ের পরিণয়যোগ্যা সেইরূপ এই বপার ভাগ তোমারই ভাগ অর্থাৎ তোমাকর্তৃকই গ্রহণীয়। সুতরাং মাতুলকন্যার বিবাহ শ্রুতিকর্তৃকও অনুগৃহীত। ব্রাহ্মাদি বিবাহে মাতুলসুতাবিবাহ যে স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে বরং স্মৃতিসম্মত তাহাই পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যগণের অবিগীত শিষ্টাচার প্রসিদ্ধ।

এইরূপে মাতুলসুতাবিবাহ শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচারসমর্থ হওয়াতে ধর্ম বলিয়াই স্বীকৃত হইল। কিন্তু ধর্ম হইলেও ইহা দেশভেদে ব্যবস্থিত।

মাধবাচার্যের এই আলোচনায় তাঁহার দেশাচারের প্রতি আনুগত্য, বহুশাস্ত্রদর্শিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রের বাচনিক অর্থের মর্যাদা

রক্ষা করিলেও মর্যাদার্থের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব সুপরিস্ফুট। যুক্তিবলে তিনি শাস্ত্র-বচনের প্রচলিত সহজ, সরল, সর্বজনবোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া দেশাচারের প্রতি প্রীতির আধিক্য দেখাইবার জন্য কুটিল পথ অনুসরণ করিয়া অপব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। মাধবাচার্যের ন্যায় সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতের নিকট এইরূপ আচরণ অপ্রত্যাশিত। দেশাচারের প্রতি একান্ত অনুরাগই তাঁহাকে এইরূপ কুটিলপথে চালিত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তিনিও যুক্তিবলে প্রত্যক্ষ স্মৃতিবিরোধী মতকে সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মনুর মতে ইহাও একরূপ নাস্তিকতাই। মাধবাচার্য দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। তিনি দাক্ষিণাত্যের শিষ্টাচরিত 'অনাচার'কে হেতুশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া যুক্তিবলে 'সদাচার' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ বঙ্গদেশে স্মার্ত-পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট তাঁহার 'পদ্ধতি' গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বঙ্গদেশের শিষ্টগণ কর্তৃক আচরিত মৎস্য মাংস ভক্ষণরূপ 'অনাচার'কে সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ—

ছাগলেয়, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু প্রভৃতি মৎস্য-মাংস ভক্ষণে যে দোষের কথা বলিয়াছেন তাহা সামান্যভাবে মৎস-মাংসের অভক্ষ্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য নহে। নিষিদ্ধ কুহূ পূর্ণেন্দু সংক্রান্তি চতুর্দশী ও অষ্টমী প্রভৃতি তিথ্যাদি বিষয়েই ব্যবস্থিত বুঝিতে হইবে। সামান্যভাবে নিষিদ্ধ হইলে তিথ্যাদি বিশেষে নিষেধের আনর্থক্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। আবার মৎস্যাদি পরিত্যাগে ফলশ্রুতিও বর্তমান। যদি সামান্যভাবেই সকল তিথিতে সকলপ্রকার মৎস্য মাংস বর্জন শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে মৎস্যাদি পরিত্যাগে ফলশ্রুতিরও কোনও অর্থ থাকিত না। সুতরাং কেবলমাত্র নিষিদ্ধ তিথ্যাদি বিষয়েই মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ, সকল প্রকার মৎস্যাদি সকল ক্ষেত্রে সামান্যভাবে বর্জনীয় নহে—ইহা বিধান করাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়।

সুতরাং ছাগলেয় যে বলিয়াছেন—"বৃথামাংসম্ ন ভোক্তব্যম্, ভোক্তব্যং শ্রাদ্ধ কর্মণি। অন্যথা ভক্ষয়ন্ বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥" অর্থাৎ সাধারণতঃ বৃথা মাংসভক্ষণ করিবেনা, কিন্তু শ্রাদ্ধকর্মে ভক্ষণ করিবে। শ্রাদ্ধকর্মভিন্ন অন্য সময়ে ব্রাহ্মণ বৃথা মাংস ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠান করিবে। যাজ্ঞ-বল্ক্যও যে বলিয়াছেন– 'মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং ভবেৎ।' অর্থাৎ কামতঃ মৎস্যভক্ষণ করিলে তিনদিন উপবাস করিবে। মনু যে বলিয়াছেন—

"নাদ্যাদ বিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ জগ্ধ্বা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য তৈরদ্যতেঽবশঃ ॥' অর্থাৎ বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ অবৈধমাংস ভক্ষণ করিবে না। অবৈধ মাংস ভক্ষণ করিলে মৃত্যুর পর অপযশ প্রাপ্ত হইবে। ব্যাসও যে বলিয়াছেন—"কুহূ পূর্ণেন্দু সংক্রান্ত্যাং চতুর্দশ্যষ্টমীষু চ। নরশ্চাণ্ডাল যোনিঃ স্যাৎ স্ত্রীতৈল মাংস ভক্ষণাৎ ॥ শ্রাদ্ধে প্রদত্তঃ বিধিনা দৈবে চাভ্যর্থিতো দ্বিজৈঃ। উপাকৃতং মহারোগান্ মাংসং ভুঞ্জীত নান্যথা ॥' অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দশী এবং অষ্টমী তিথিতে স্ত্রী, তৈল ও মাংস ভক্ষণ করিলে মানুষ চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রাদ্ধে ও দৈবকার্যে ব্রাহ্মণকর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া মাংসভক্ষণ করিবে অথবা মহারোগে আক্রান্ত হইলে দেবতোদ্দেশে হতপশুর মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে—এই সকল নিষেধবচনই চতুর্দশী প্রভৃতি বিষয়ক। অন্যথা সামান্যভাবে মৎস্য-মাংস অভক্ষ্য হইলে তিথিবিশেষে নিষেধের কোনও অর্থ ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আরও, যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিয়াছেন—'সর্বান্ কামান্ অবাপ্নোতি হয়মেধ ফলং তথা। গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্মাংস বিবর্জনাৎ ॥' অর্থাৎ যে বিপ্র গৃহে বাস করিয়াও মাংস বর্জন করে সেই বিপ্রমুনির সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। এই মৎস্য-মাংস পরিত্যাগে ফলশ্রুতিও উপপন্ন হয় না। সামান্যভাবে মৎস্য-মাংসের অভক্ষ্যত্ব প্রতিপাদনই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় হইলে এইরূপে ফলশ্রুতি নিরর্থকই হইয়া পড়ে। মনুও বলিয়াছেন—'ন মাংসভক্ষণে দোষো, ন মদ্যে চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' ॥ অর্থাৎ মাংসভক্ষণ সুরাপান প্রভৃতিতে কোনও দোষ নাই কারণ ইহা প্রাণীগণের সহজাত প্রবৃত্তি সম্ভূত। কিন্তু এই সহজাত প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইলে মহাফল লাভ হয়। অতএব মৎস্য মাংসভক্ষণে কোনও দোষ ঘটিতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। মনু যে বলিয়াছেন—'যক্ষরক্ষঃ পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্। তদ্ ব্রাহ্মণৈর্ন ভোক্তব্যং দেবানাং ভুঞ্জতাং হবিঃ' অর্থাৎ মদ্য, মাংস, সুরা এবং আসব হইল যক্ষ, রক্ষ এবং পিশাচের অন্ন। হবির্ভুক দেবগণেরও ইহা অন্ন। ব্রাহ্মণ কদাপি ইহা ভক্ষণ করিবে না। এই নিষেধবচনও আমমাংস বিষয়েই বুঝিতে হইবে। কারণ, আমমাংসকেই না।আগমে রাক্ষসান্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ করা হইয়াছে।

দেবল বলিয়াছেন—'মৎস্যাশ্চ বিকৃতাকারাঃ সর্পশীর্ষা দরীশয়াঃ··· নৈব ভক্ষ্যা

দ্বিজাতিভিঃ'—অর্থাৎ বিকৃতাকার সর্পশীর্ষ ও দরীশয় মৎস্য ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য। এই নিষেধবচনের দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যাহারা মস্তক উত্তোলন করে না এবং যাহারা গর্তের মধ্যে বাস করে না সেই সকল মৎস্য অভক্ষ্য নহে।

শাস্ত্রকারগণ যে সকল মৎস্য এবং যে সকল জীবের মাংস অভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন কেবল তাহাদিগের ভক্ষণেই দোষ ঘটে এবং ঐরূপ নিষিদ্ধ মৎস্য মাংস ভক্ষণের জন্য শাস্ত্রকারগণ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। অনিষিদ্ধ মৎস্য মাংস ভক্ষণে দোষের অভাব সুতরাং প্রায়শ্চিত্তেরও অভাব—ইহাই হইল ভট্ট ভবদেবের অভিমত।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাঢ় দেশে গোবর্দ্ধন গঙ্গোপাধ্যায়ের ঔরসে ভবদেব ভট্টের জন্ম হয়। ইহারা কৌথুমি শাখান্তর্গত সামবেদী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ভবদেব ভট্ট প্রথমে রাজা হরিবর্মদেবের শ্রীকরণাধিপ ছিলেন এবং পরে তাঁহার বিশ্রামসচিব হন। ভবদেবের 'দর্শকর্মপদ্ধতি' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে অনিষিদ্ধ মৎস্য-মাংস ভক্ষণে কোনওরূপ দোষের অভাব সুতরাং প্রায়শ্চিত্তেরও অভাব এইরূপ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন। তিনিও হেতুশাস্ত্রকেই আশ্রয় করিয়া মন্বাদিশাস্ত্রের সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্তের অপহ্নব করিয়াও রাঢ়দেশীয় শিষ্টগণস্বীকৃত অনাচারকে যুক্তিবলে সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করিবে না—ইহাই হইল সর্বভারতীয় ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণের সামান্য সিদ্ধান্ত। রাঢ়ীয় ভবদেব এই সামান্য সিদ্ধান্তকে ব্যবস্থিত করিয়া নিষিদ্ধ মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিবে না, করিলেই দোষভাব হইবে—এইরূপ অর্থ করিলেন। সুতরাং তাঁহার মতে অনিষিদ্ধ মৎস্য মাংস ভক্ষণে কোনও রূপ দোষ ঘটিতে পারে না। ইহাও কি একরূপ প্রাদেশিকতা নহে? ইঁহারাও কি মন্বাদি শাস্ত্রের অবমাননাকারী হেতুশাস্ত্রাশ্রয়ী 'নাস্তিক' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন? ভট্টকুমারিলের সময় হইতেই শাস্ত্রের এইরূপ নবনব ব্যাখ্যা প্রসার লাভ করিতেছে। শাস্ত্রের অবমাননাকারী এইসকল ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌কে নবনাস্তিক নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহারা শাস্ত্রবচনের কদর্থ করিয়াও নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিতে আদৌ পশ্চাদ্‌পদ হন না। ইহাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রবচনের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না।

শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়াও এই নবনাস্তিকগণ দেশাচারকে শাস্ত্রসম্মত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ধর্মবিষয়ে দেশাচারই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শাস্ত্রকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই দেশাচারের অনুকূলরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং এই আচারানুগত ব্যাখ্যার জন্যই তাঁহারা নিজনিজ নিবন্ধে বুদ্ধির প্রাখর্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিলেন—বিধবাবিবাহের অনুকূল শাস্ত্রবচনের অভাব নাই। এমন কি, প্রত্যক্ষ শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ বলিলেন—'উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তাগ্রাভস্যাদি ধীষোস্তমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূবেতি।' —হে নারী তুমি গতপ্রাণ এই পতির নিকট গমন করিয়া শয়ন করিয়াছ। এই পতির নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীবলোকের দিকে অগ্রসর হও। তুমি পাণিগ্রহণকারী পুনর্বিবাহেচ্ছু এই পতির জায়াত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিকট গমন কর।

গৌতম বলিলেন—ভর্তার মৃত্যুর পর যদি অনাহত যোনি নারী পুনরায় বিবাহের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এই বিষয়ে বিচারের কোন অবকাশ নাই। বৃহস্পতি বলিলেন—অক্ষত যোনি নারীর ভর্তার মৃত্যুর পর যদি পুনরায় বিবাহের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে পুনরায় বিবাহ করাই শাস্ত্রকারগণের অভিমত। বৈশম্পায়ন বলিলেন—স্ত্রী না থাকিলে পুরুষের যেমন বহুবিবাহের ব্যবস্থা আছে সেইরূপ স্বামীর অভাবে স্ত্রীলোকেরও বহুবিবাহ হইতে পারে। মহাভারতোক্ত নাগরাজের বিধবা কন্যা উলূপীর বিবাহই তাহার সাক্ষ্যস্থল। কাত্যায়ন বলিলেন—ভর্তা যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, বিকর্মস্থ, সগোত্র, দাস অথবা দীর্ঘাময় হয় তাহা হইলে ঊঢ়া কন্যাকেও প্রাবরণ ভূষণাদির সহিত অন্যবরের হস্তে অর্পণ করিবে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হইয়াছে যে, বিধবাবিবাহ এক সময় ধর্মমূলক হইয়া থাকিলেও কলিতে তাহা বর্জনীয়। কারণ, লোকবিদ্বিষ্ট ধর্ম মানুষের আচরণীয় নহে।

এইরূপ যুগভেদে ধর্মভেদের ব্যবস্থা যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'সময়ানুগতা চেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া। তস্মাৎ অবস্থাং গময়ং বীক্ষ্য ধর্মং সমাচরেৎ॥'। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহুঃ ধর্মে ধারয়তে প্রজাঃ। যৎ স্যাদ্ধারণ সংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়॥'

এইরূপ উক্তির অভিপ্রায় এই যে, ধর্ম শব্দটি ধারণ অর্থে প্রযুক্ত। মানবীয় শক্তি বিবেচনায় সময়োপযোগী ধর্মের ব্যবস্থা শাস্ত্রে না থাকিলে পূর্বস্থাপিত পদ্ধতি সমাজকে ধারণ অর্থাৎ সংরক্ষণ করিতে পারে না। সুতরাং নরমেধ প্রভৃতি পুরাতন যুগের ধর্মকৃত্য অবস্থা বিবেচনায় কলিতে দূষণীয় এবং সত্যাদিযুগে যে পাপীর সম্ভাষণ ও ধনুর্গ্রহণাদি অধর্মজনক ছিল, সময় ও অবস্থা বিবেচনায় কলিতে তাহা অনিন্দনীয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সময়ান্তরে বঙ্গাদিদেশ গমন নিষিদ্ধ থাকিলেও (অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সুরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারম্ অর্হতি ॥) অধুনা 'রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মাপুত্রান্ ভাগং শিবে। বঙ্গদেশে ময়া প্রোক্ত সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক ॥'—এই মহাদেবের উক্তি অনুসারে অধুনা তাহা ধর্মজনক বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ সময়ভেদে শাস্ত্রবচনানুসারে দত্তা কন্যার পুনর্দানাদি কৃত্য অর্থাৎ সত্যযুগাদিতে ধর্ম বলিয়াই বিবেচিত হইত, ইহাই নারদীয় বচনের অভিপ্রায়। একবার প্রদত্ত ঘটাদির ন্যায় সকৃৎ প্রদত্তা কন্যাকে পুনরায় দান করা যাইতে পারে না। কারণ, একবার দান করিলেই সেই কন্যার উপর পিতার স্বত্ব আর থাকে না, সুতরাং প্রদত্তা কন্যার পুনর্দানের অধিকারই লোপ হয়—এইরূপ বলাও সঙ্গত হইবে না। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে 'অর্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্যবান্। সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতাঃ ॥ ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা। পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপনার্দীনচেতনা ॥ পরিণীতা নরমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ। সাপ্যুদ্বাহ্য পুনঃ পিত্রা শৈবধর্মেষ্বয়ং বিধিরিত্যাদি ॥' সুতরাং মহাভারত মহানির্বাণ প্রভৃতিতে পুনর্দানের বিধায়ক শাস্ত্র পাওয়া যাওয়ায় এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণবচনের সহিত ইহার একবাক্যতা হওয়াতে কলীতর যুগে পিতা প্রভৃতি দত্তা কন্যারও পুনর্দানবিষয়ে সম্যক্ অধিকারী, ইহাই বুঝা যাইতেছে। এইরূপ, হেমাদ্রিতে উক্ত হইয়াছে—দত্তা অক্ষতা কন্যার পুনর্দান এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য কলিযুগে বর্জনীয়। আদিত্যপুরাণ বলিলেন—ঊঢ়া কন্যার পুনরায় উদ্বাহ, জ্যোষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃজায়াগমন এবং কমণ্ডল বিধায়ণ—কলিযুগে এই পাঁচটি 'ন কুর্বীত'।

মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে দ্বিজাতিগণ বিধবানারীকে অন্য কাহারও সহিত নিয়োজিত করিবে না। অন্যের সহিত নিয়োজিত করিলে সনাতন ধর্মের হানি হইবে। বিবাহমন্ত্রে বিধবাবিবাহের বা নিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। বিধান

[illegible] পক্ষে ইহা বিগর্হিত পশুধর্ম। এই ধর্ম বেন রাজার শাসনে মনুষ্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া কথিত আছে। বৃহস্পতি বলিলেন—মনু স্বয়ংই উক্ত নিয়োগের নিষেধ করিয়াছেন। সত্যত্রেতাদি যুগে তপোজ্ঞাননিষ্ঠ মানবগণ বৈধ নিয়োগ করিতে সমর্থ ছিলেন। কলিযুগে আয়ুর হ্রাসবশতঃ তাদৃশ শক্তি ক্ষীণ হওয়াতে তমঃপ্রভাবযুক্ত মনুষ্যগণ কেবল অবৈধ নিয়োগের দ্বারা যাদৃচ্ছিক অপত্যোৎপাদনের জন্যই যত্ন করিবে এই বিবেচনা করিয়াই বৃহস্পতি নিয়োগ-ধর্মকে যুগভেদে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

মনুটীকায় 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপদৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে॥'—এই পরাশরবচন উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এইস্থলে পতি শব্দটি গ্রামপতি, নরপতি প্রভৃতির ন্যায় পালনক্রিয়া নিমিত্তক। অতএব পালনের জন্য সৈরিন্ধ্রী কর্মাদির দ্বারা নিজের বৃত্তির জন্য অন্য পতিকে আশ্রয় করিবে। পরাশরবচনের এই অর্থই মেধাতিথি প্রকাশ করিয়াছেন। মাধবাচার্য কিন্তু ইহাকে বাগ্‌দত্তা কন্যাবিষয়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি পতৌ এই পদের পরিবর্তে অপতৌ এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায় ঋগ্বেদ, পরাশরসংহিতা ও মহাভারতাদির দ্বারা সমর্থিত হইলেও কোনো নিবন্ধকারই প্রচলিত নহে বলিয়া বিধবাবিবাহকে বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বিধবাবিবাহের অনুকূল শাস্ত্রবচনকে 'কল্পীতরপর' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কোনো কোনো নিবন্ধ-কার বিধবাবিবাহ প্রতিষেধক শাস্ত্রকে 'দ্বিজাতিস্ত্রীপরম্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, উক্ত নিষেধবচনগুলিতে 'দ্বিজঃ' 'দ্বিজাতিভিঃ' প্রভৃতি শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকাতে নিষেধবচনগুলি দ্বিজাতি স্ত্রীর পক্ষেই প্রযোজ্য। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কলিযুগে নিয়োগনিষেধক শাস্ত্র সর্ববর্ণের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু বিধবার পত্যন্তর প্রতিষেধকশাস্ত্র কেবল মাত্র দ্বিজাতি স্ত্রীগণের পক্ষেই প্রযোজ্য। পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণ ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আবার কোনও কোনও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিলেন—সমুদ্রগমন কলিতে প্রতিষিদ্ধ। এসম্বন্ধে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা সমুদ্রে গমন, কমণ্ডলুধারণ, অসবর্ণাবিবাহ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথির জন্য পশুহত্যা, শ্রাদ্ধের জন্য মাংস আহরণ, অরণ্যাশ্রমে গমন, দত্তা

কন্যার পুনর্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যব্রত, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, মরণের উদ্দেশ্যে হিমালয় প্রভৃতি পর্বতে আরোহণ, গোমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি মহর্ষিগণ কলিতে বর্জনীয় বলিয়াছেন। বিদ্যাভ্যাসাদির জন্য ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলেও প্রাসঙ্গিক সমুদ্রযাত্রা করা যাইতে পারে। সমুদ্রে প্রতিষিদ্ধ গমনপাপে গন্তা অবশ্য আক্রান্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই—এইরূপ কুতর্ক উপস্থিত হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যেমন মরণের উদ্দেশ্যে হিমালয়াদি গমন কলিতে বর্জনীয় তেমন মরণের উদ্দেশে সমুদ্রগমন কলিতে প্রতিষিদ্ধ।

কাশীরাম 'সম্বন্ধতত্ত্ববিবৃতি' নামক গ্রন্থে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচনে 'ইমান্ ধর্মান্' এই শব্দদ্বারা শাস্ত্রবিহিত সমুদ্রগমন প্রভৃতিই বর্জনীয় হইয়াছে। যাদৃচ্ছিক সমুদ্রগমন শাস্ত্রপ্রতিপাদিত নহে। সুতরাং তাহা ধর্ম হইতে পারে না। অতএব ভ্রমণের উদ্দেশে সমুদ্রগমনে পাপের লেশও উপস্থিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ধর্ম নহে। সেইজন্যই বর্তমানে ভ্রমণের জন্য ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই হিমালয়ে যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহারা পাপভাক্ হইতেছে না। মরণাদির উদ্দেশে সমুদ্রগমনের ফলবোধক শাস্ত্রও রঘুনন্দন উল্লেখ করিয়াছেন—জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে আনন্দ নামক স্বর্গ, অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে প্রমোদ নামক স্বর্গ লাভ হয় ইত্যাদি। এই স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, পূর্বকালে অতি বৃদ্ধত্বাদিনিবন্ধন ভোগের বিতৃষ্ণা হইলে সমুদ্রে প্রবেশ, অগ্নিতে প্রবেশ প্রভৃতির দ্বারা প্রাণত্যাগ করা শাস্ত্রবিহিত ধর্ম ছিল—তাহাতে আত্মত্যাগজনিত পাপ হইত না। কিন্তু কলিকালে সেসকল ধর্ম বর্জনীয়। সুতরাং বর্তমানে সমুদ্রগমন পাপজনক নহে—ইহাই শাস্ত্রাভিমত। ইহাতে কোন তর্কই স্থান পাইতে পারে না। প্রদর্শিত বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচনে সমুদ্রগমন প্রভৃতি ধর্মকার্যের কলিতে বর্জন উপদেশ থাকাতে ঐসকল কার্য কলিকালে পর্যুদস্ত। ইহা ধর্মশাস্ত্রানুসারে সুসিদ্ধান্ত। যাহা যাদৃচ্ছিক তাহা পর্যুদস্ত হয় না। সুতরাং বর্তমানযুগে প্রচলিত সমুদ্রগমন প্রতিষিদ্ধ নহে, পাপজনকও নহে।

আপন প্রযত্নে নৌকাদি চালনা করিয়া সমুদ্রে গমন করিবে না—ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহাদিগের পক্ষে যুক্তি এই যে মনুর তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রাদ্ধপ্রকরণে অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ পরিগণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে সমুদ্রযায়ী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধভোজনের অযোগ্য। কুল্লূক ভট্ট সমুদ্রযায়ী শব্দের ব্যাখ্যা করিতে

গিয়া বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি বাহিত্রাদিদ্বারা নৌকাচালনা করিয়া সমুদ্রে গমন করে সেই ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অযোগ্য। বাহিত্র হইল দাঁড় ও কর্ণাদি। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের শ্রাদ্ধভোজনের বিধান না থাকাতে অপাঙ্‌ক্তেয় বিধি একমাত্র ব্রাহ্মণের পক্ষেই ব্যবস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ বাহিত্রাদি দ্বারা নৌকা চালনা করিয়া সমুদ্রে গমন করিলেও পাপী হইবে না—ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। কোন কোন গ্রন্থে কুল্লূক ভট্টের টীকায় 'বহিত্রাদিনা' এইরূপ পাঠও দেখা যায়। বহিত্র শব্দের অর্থ নৌকা। 'বহিত্র' অথবা 'বাহিত্র' যাহাই পাঠ হউক না কেন, উভরপক্ষেই স্বীয় প্রযত্নে নৌকা চালনা করিয়া সমুদ্রে গমন করাই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ও পাপজনক বলিতে হইবে। এইরূপ ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয় এবং শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অযোগ্য।

বস্তুত বহিত্রাদিদ্বারা নৌকা চালনা করিয়াই হউক অথবা অন্য কোন প্রকারেই হউক, মরণের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে গমন করিলেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ পাপী হইবে, কিন্তু ভ্রমণাদির জন্য সমুদ্রগামীর কদাচ পাপস্পর্শ হইবে না।

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণের ইচ্ছানুযায়ী সমুদ্রগমন ঋগ্বেদেও লিখিত আছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ বরুণকে বলিতেছেন—আমরা নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রে যাইব এবং সমুদ্রের মধ্যস্থলে নতোন্নত বীচীসমূহে আন্দোলিত হইয়া সুখে বিচরণ করিব। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে বরুণ আপন নৌকায় বশিষ্ঠকে আরোহণ করাইলেন এবং সমুদ্রবিহারদ্বারা বশিষ্ঠকে বিপুলবলশালী ও তপস্যাসমর্থ —রিয়া দিলেন। অপর একস্থানে সায়ণাচার্য একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন—পূর্বকালে ক্ষত্রিয়কুলে ভূষণ তুগ্র নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। সেই নরপতি সাগরদ্বীপ নিবাসী ম্লেচ্ছগণদ্বারা উপক্রুত হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য ভুজ্যু নামক আপন পুত্রকে সসৈন্যে সমুদ্রপথে নৌকাযোগে প্রেরণ করিলেন। নৌকাসকল সমুদ্রের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে প্রবল বায়ু ও বীচীসমূহে আক্রান্ত হইয়া পতনোন্মুখ হইল। তখন ভুজ্যু ঘোর বিপদে পতিত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় রাজপুত্রের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সৈন্যের সহিত শতবাহিত্রযুক্ত নৌকাতে অবস্থিত রাজপুত্রকে উদ্ধার করিলেন এবং তিন দিবসের মধ্যে সৈন্যগণের সহিত ভুজ্যুকে পিতার সমীপে নিরাপদে উপস্থিত করিয়া দিলেন।

ঋগ্বেদের অপর একস্থলে সমুদ্রগমনের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে—ধনাগমের

অভিলাষী হইয়া বণিকগণ যেমন দ্বীপ-দ্বীপান্তরে গমন করিবার জন্য নৌকারোহণে সমুদ্রে অধিরোহণ অর্থাৎ সমুদ্রপ্রাপ্ত হয় সেইরূপ যজ্ঞে হোব্য আহরণকারী যজমানগণ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া অভিলষিত ফললাভের জন্য একাগ্রতাসহকারে নমস্কারপূর্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে স্তব করিয়া থাকে।

এইরূপ বেদে অনেকস্থানে সমুদ্রগমনের বিষয় উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সভাপর্বের রাজসূয়যজ্ঞের প্রস্তাবে করগ্রহণ করিবার জন্য পাণ্ডবদিগের সমুদ্রে ও ম্লেচ্ছদেশে গমনের কথা বর্ণিত আছে। সাগরকুক্ষিনিবাসী ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্বর কিরাত, যবন, শক, এবং সাগরে অন্তর্দ্বীপনিবাসী প্রবল পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছ নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া পাণ্ডবগণ করগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবগণ প্রত্যাগত হইয়া কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসঙ্গ মহাভারতে দৃষ্ট হয় না।

শুচি ও অশুচি

অশৌচ একটি স্মার্তাচার। মাধবাচার্য তাঁহার পরাশরভাষ্যে শুচি ও অশুচি প্রসঙ্গে একটি বিধি উদ্ধৃত করিয়াছেন—'শুচিনা কর্ম কর্তব্যম্'। শুচিব্যক্তিই কর্ম অর্থাৎ বেদোক্ত যাগাদি কর্ম করিবার অধিকারী। এই শুচিতা যদিও পুরুষের স্বাভাবিকগুণ তথাপি কখনও কখনও অশৌচাখ্য দোষ কাহারও কাহারও উপর কিছুকালের জন্য বর্তায়। সেই অশৌচ নির্দিষ্ট কালাপগমে স্নানাদির দ্বারা অপনোদিতও হয়। রঘুনন্দন তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে এই অশৌচকে 'বৈদিককর্মানর্হত্ব প্রযোজকীভূত সংস্কারবিশেষ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের মতে অশৌচে পাপপর্যায় অঘপদ দৃষ্ট হওয়ায় কেবল শুচিতার অভাবমাত্রকেই অশৌচ বলা যাইবে না। ইহার ভাবরূপতাই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার মতে বিহিত কর্মবিরোধী অদৃষ্ট বিশেষের নামই অশৌচ। অশৌচ শব্দটি যোগরূঢ়।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রকার বলিলেন—'দানাধ্যয়নে বর্জয়েয়ন্ দশাহং সপিণ্ডেষু'। সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণ ঘটিলে দশদিন দান এবং অধ্যয়ন বর্জন করিবে। এই স্থলে অধ্যয়ন পদটির দ্বারা বেদ-অধ্যয়নকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গৌতম ধর্মসূত্রকার বলিলেন—'শাবমাশৌচম্ দশরাত্রম্ অনৃত্বিগ্‌ দীক্ষিত ব্রহ্মচারিণাম সপিণ্ডানাম্'।

ঋত্বিক, দীক্ষিত এবং ব্রহ্মচারী ভিন্ন সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণ ঘটিলে দশরাত্র অশৌচ প্রতিপালন করিবে। 'একাদশরাত্রং ক্ষত্রিয়স্ত'—দীক্ষিত ব্রহ্মচারী ব্যতিরিক্ত জ্ঞাতিমরণে ক্ষত্রিয়ের একাদশরাত্র অশৌচ হইবে। 'দ্বাদশরাত্রং বৈশ্যস্ত অর্ধমাসম্ একে'—বৈশ্যদের সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণ ঘটিলে দ্বাদশরাত্র অশৌচ প্রতিপালন করিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে বৈশ্যদের অশৌচ অর্ধমাস। 'মাসং শূদ্রস্ত'—শূদ্রগণ সপিণ্ডমরণে একমাস অশৌচ প্রতিপালন করিবেন।

অশৌচ কি? টীকাকার অশৌচের লক্ষণ জানাইলেন—'কর্মণি অনধিকারঃ অভোজ্যান্নতা অস্পৃশ্যতা দানাদিষু অনধিকারিতা।'

আশ্বলায়ন বর্ণভেদে অশৌচের কালভেদ করেন নাই। গৌতম ধর্মসূত্রেই প্রথম তাহা প্রদর্শিত হইল।

ইহার পর মনুসংহিতাকার বলিলেন—'শুদ্ধ্যেদ্ বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধতি॥' সপিণ্ডজ্ঞাতিমরণে ব্রাহ্মণ দশদিন, ক্ষত্রিয় বারোদিন, বৈশ্য পনেরো দিন এবং শূদ্র একমাস অশৌচ প্রতিপালন করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যও মনুরই অনুসরণ করিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রের একমাস। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ইহার সহিত একটি নূতন ধারা যোজনা করিলেন। সৎ শূদ্রগণের অশৌচ হইবে অর্ধমাস। সৎ শূদ্র কাহারা? যাহারা ত্রৈবর্ণিকের পরিচর্যা করিয়া তাহাদের নিকট বৃত্তি লাভ করে তাহারা সৎ শূদ্র। উশনা বলিলেন—ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশদিন, বৈশ্যের পঞ্চদশদিন এবং শূদ্রের একমাস অশৌচ হইবে। কিন্তু তিনি আর একটি নূতন তথ্য ইহার সহিত যোজনা করিলেন: শাস্ত্রকার ঋষিগণ এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্রগণের মধ্যে যাহারা সৎ ব্রাহ্মণকে অখণ্ড মনোযোগের সহিত সেবা করে তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায়ই দশদিনে অশৌচ হইতে শুদ্ধিলাভ করে। হীনতর জাতীয়ের মধ্যে যদি কেহ ক্ষত্রিয়ের সেবা করে তাহা হইলে সে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দ্বাদশাহেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং অনুরূপভাবে যদি কেহ বৈশ্যের সেবা করে তবে পঞ্চদশাহে শুদ্ধ হইবে।

অত্রিও অশৌচের সাধারণ বিধি স্বীকার করিয়া একটি নূতন ধারা সংযোজন করিয়াছেন—সাগ্নিক এবং বেদজ্ঞের পক্ষে একাহাশৌচ, কেবল বেদজ্ঞের পক্ষে

ত্র্যহ এবং বেদাগ্নিবিহীন ব্রাহ্মণের পক্ষে দশাহাশৌচ। তিনি সাগ্নিক প্রভৃতির মরণে অশৌচহীনতারও বিধান করিয়াছেন।

দক্ষ দশ প্রকার অশৌচের কথা বলিয়াছেন—১. সদ্যঃশৌচ ২. একাহাশৌচ ৩. দ্ব্যহাশৌচ ৪. ত্র্যহাশৌচ ৫. চতুরহাশৌচ ৬. দশাহাশৌচ ৭. দ্বাদশাহশৌচ ৮. পঞ্চদশাহশৌচ ৯. মাসাশৌচ ১০. যাবজ্জীবনাশৌচ।

যে ব্রাহ্মণ সাঙ্গ সকল্প এবং সরহস্য বেদার্থবিৎ এবং তৎ তৎ ক্রিয়াবান্ তিনি সদ্যঃশৌচ। তিনি কখনই অশুচি হন না। রাজা, ঋত্বিক, দীক্ষিত প্রভৃতি এবং বিদেশগতের মরণে, প্রারব্ধযজ্ঞ ব্যক্তির মরণে এবং প্রারব্ধ ব্রতিকের মরণে সদ্যঃশৌচ বিহিত হইয়াছে। সাগ্নিক এবং স্বাধ্যায়বান্ ব্যক্তির পক্ষে একাহাশৌচ। হীন, হীনতর এবং হীনতম ব্যক্তিদের পক্ষে যথাক্রমে দুই, তিন ও চারদিন অশৌচ বিহিত হইযাছে। জাতিমাত্র ব্রাহ্মণেব পক্ষে দশদিন এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বারোদিন, বৈশ্যের পক্ষে পনেরো দিন এবং শূদ্রের পক্ষে একমাস অশৌচ বিহিত হইয়াছে।

যাহারা অস্নাত এবং অহুত অবস্থায় দান না কবিয়া আহার্য গ্রহণ করে তাহাদের জন্য সদাশৌচ বিহিত হইয়াছে। যাহারা চিররুগ্ণ, কৃপণ, ঋণগ্রস্ত, ধর্মাচারবর্জিত, নিরক্ষর এবং স্ত্রী-শাসিত তাহারাও সদা অশুচি। ইহাদের জন্যই যাবজ্জীবন অশৌচ বিহিত হইয়াছে।

লিখিত বলিলেন—ত্রিপুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণে দশাহ, পঞ্চপুরুষ পর্যন্ত সপ্তাহ এবং ষট্পুরুষ পর্যন্ত একাহাশৌচ বিহিত হইয়াছে।

পরাশর বলিলেন—অগ্নিবেদ সমন্বিত ব্রাহ্মণ একাহে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেন। কেবল বেদব্রাহ্মণের পক্ষে ত্র্যহাশৌচ হইবে। অগ্নি ও বেদ উভয়হীন ব্রাহ্মণের পক্ষেই দশাহাশৌচ বিহিত হইয়াছে।

নির্ণয়সিন্ধুকার বলিলেন—পরাশর যে বলিয়াছেন অগ্নি এবং বেদসমন্বিত ব্রাহ্মণ একাহেই শুদ্ধ হইবে, কেবল বেদব্রাহ্মণ তিনদিনে শুদ্ধ হইবে এবং অগ্নি ও বেদ উভয়হীন ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হইবে, তাহার অর্থ কেবল শ্রৌতাগ্নি ব্রাহ্মণেরও কেবল বেদব্রাহ্মণের ন্যায় ত্র্যহাশৌচ হইবে। হারলতার মতে এই সঙ্কোচ কেবল হোম ও অধ্যয়নবিষয়েই বুঝিতে হইবে, সন্ধ্যাদি বিষয়ে নহে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন, শাতাতপের মতে সকল বর্ণেরই জননাশৌচ ও মরণাশৌচ দশরাত্র। দেবলও বলিলেন—অপর কেহ কেহ কর্মের ক্ষয় দেখিয়া নিধনে এবং প্রসবে সকল

বর্ণের দশরাত্র অশৌচ বিধান করিয়াছেন। হারলতাকার কর্মহানির আশঙ্কা উপস্থিত হইলে অতি উৎকৃষ্ট, পীড়িত ও বিপ্রপরিচর্যাপর শূদ্রের দশরাত্র অশৌচ বিধান করিয়াছেন। দক্ষ যে সদ্যঃশৌচ, একাহ, ত্র্যহ, চতুরহ, ষড়হ, দশাহ, দ্বাদশাহ, পক্ষ, মাস ও মরণান্ত অশৌচের কথা বলিয়াছেন তাহা আপদনাপদ গুণবদগুণবদ বিষয়ে অথবা দেশান্তর ভেদে ব্যবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে। সদ্যঃ শৌচাদি গুড়হান্ত পক্ষ যাযাবরাদির জন্য। বিজ্ঞানেশ্বরের মত উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যাহা অস্বর্গ্য এবং লোকবিদ্বিষ্ট তাহা ধর্ম হইলেও আচরণ করিবে না। যেমন মধুপর্কে পশ্বালম্ভন বেদবিহিত স্থতরাং ধর্ম হইলেও শিষ্টবিগর্হিত বলিয়া তাহা অনাদরণীয়।

তিনি মাধবের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষ অঘসঙ্কোচ কলিবর্জ্যে উক্ত আছে "স্থতরাং সপিণ্ডমরণে বিপ্রের দশাহই অশৌচ হইবে। কলিযুগে কল্পান্তরের অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ কিল্বিষী হইবেন।"—এই হারীতোক্তি অনুসারে ন্যূনাশৌচ পক্ষগুলি যুগান্তরবিষয়ক, মরণান্তক পক্ষগুলি নিন্দার্থবাদ। তাহা না হইলে 'নামধারক বিপ্র দশাহস্থতকী হইবে'—এই বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে।

কিন্তু পরাশরের বিধানকে যুগান্তরবিষয়ক বলিয়া নির্দেশ করা সমীচীন হইবে কিনা তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ, 'কলৌ পরাশর স্মৃতঃ' —পরাশরের স্মৃতি কলিকালের জন্যই বিহিত হইয়াছে।

মাধব অশৌচসঙ্কোচের কথা বলিতে গিয়া পরাশরের (১।৩।৫) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—'যে বিপ্র অগ্নি ও বেদসমন্বিত সে একাহেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ কেবল বেদসমন্বিত তাহার ত্র্যহাশৌচ হইবে। অগ্নি ও বেদ উভয়হীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধি দশদিনে।' এইস্থলে 'অগ্নি' শব্দের দ্বারা আহবনীয়াগ্নি প্রভৃতিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল অগ্নির দ্বারা ও তৎসাধ্য দর্শপৌর্ণ মাস্যাদিকেই উপলক্ষণ করিতে হইবে। এই অশৌচসঙ্কোচ স্বাধ্যায়দুর্মেধা বহুতর সপিণ্ড-সঙ্কুচিতবৃত্তি ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহাদির জন্য বুঝিতে হইবে, সকল কর্মের জন্য নহে। তাই গৌতম বলিলেন—ব্রাহ্মণের স্বাধ্যায়ের যাহাতে নিবৃত্তি হয় তাহার জন্য (গৌ. স্মৃ. ১৪।২১)। ইহার অর্থ এই যে ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণাশৌচ স্বীকার করিলে স্বাধ্যায়ের নিবৃত্তি ঘটে। তাহা যাহাতে না ঘটে তাহার জন্যই অশৌচসঙ্কোচ বিহিত হইয়াছে। স্বাধ্যায়ানিবৃত্তি গ্রহণের দ্বারা প্রতিগ্রহেরও উপলক্ষণ করা

হইয়াছে। অন্যথা অশ্বস্তনিকাদি সঙ্কুচিতবৃত্তি ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণাশৌচ স্বীকার করিলে জীবনধারণই সম্ভব হইবে না। এইরূপ একাহাশৌচ বিধান অশ্বস্তনিক বিষয়ক, ত্র্যহাশৌচ বিধান ত্র্যহিকবিষয়ক এবং অসঙ্কুচিতবৃত্তি ব্রাহ্মণের জন্যই দশাহ বিধান। এইরূপে দক্ষোক্ত সদ্যঃশৌচাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃত্তি সঙ্কোচের দ্বারা অশৌচ সংগ্রহকারও বলিয়াছেন—'শিল, উঞ্ছ এবং অযাচিত বৃত্তির দ্বারা যে ব্রাহ্মণ জীবনধারণ করে তাহার সদ্যঃ শুদ্ধি।'

প্রশ্ন উঠিতে পারে 'যে ব্রাহ্মণ অগ্নি এবং বেদসমন্বিত' এই বিশেষণের বলে সকল কার্যেই এই অশৌচসঙ্কোচ বিদ্বৎ ও অবিদ্বৎ বিষয়ে গ্রহণ করা হইবে না কেন? উত্তরে বলা যায় 'ব্রাহ্মণের সপিণ্ডস্থলে মরণাশৌচ দশাহে বিহিত হইয়াছে' —(ম. স্মৃ. ৫ ৫৯) এই মনুবচনে অবিশেষরূপেই দশাহাশৌচ বিহিত হইয়াছে। সামান্যপ্রাপ্ত দশাহশৌচের বিদ্বৎ অবিদ্বৎ বিষয়ে বাধ, এইরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে। বাধের অনুপপত্তি হেতুকত্ব হেতু যতক্ষণ পর্যন্ত অবাধিত বিষয়ে অনুপপত্তির নিরাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাধ স্বীকার করা যাইতে পারে। এইস্থলে অধ্যয়ন এবং প্রতিগ্রহাদিমাত্রই বাধরূপে বলা হইয়াছে। দশাহাশৌচ বাধের দ্বারা একাহাশৌচ বিধানের চরিতার্থতা হেতু সর্বত্র দশাহাশৌচের বাধ ঘটিল না। অগ্নিবেদসমন্বিতত্ব অশ্বস্তনিকের একাহাশৌচ বিধির স্তুতির জন্য। ইহা একাহাশৌচ বিধির অধিকারীর বিশেষণ নহে। মনু যে বলিয়াছেন 'দশদিন পর্যন্ত উভয়কুলের অন্নভোজন করিবে না। দান, প্রতিগ্রহ, হোম ও স্বাধ্যায়ের নিবৃত্তি ঘটিবে' (ম. স্মৃ. ৫।৬২) তাহার দ্বারা অসঙ্কুচিতবৃত্তি বিষয়েই প্রতিগ্রহাদির নিষেধ করা হইয়াছে। অথবা উক্ত অপবাদের প্রতি প্রসবাভিপ্রায়েই উহা গ্রহণ করিতে হইবে।

যদি বৃত্তিসঙ্কোচ এবং অসঙ্কোচমূলকই অশৌচসঙ্কোচে ব্যবস্থাপিত হয় তাহা হইলে অত্যন্ত অসঙ্কুচিতবৃত্তি নির্গুণ ব্রাহ্মণের আমরণাশৌচের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সেইজন্য পরাশর অশৌচের অবধি অর্থাৎ শেষ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন —জন্মকর্ম পরিভ্রষ্ট, গর্ভাধানাদি সংস্কাররহিত, সন্ধ্যা উপাসনাদি বর্জিত নামধারক বিপ্রের দশাহাশৌচ হইবে (প. ১।৩।৬)। ব্রহ্মবীজ সমুৎপন্ন মন্ত্রসংস্কারবর্জিত জাতি মাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে তিনি ব্যাস নামধারক বিপ্র বলিয়াছেন। গর্ভাধানাদিযুক্ত এবং উপনয়নযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি কর্মবিৎ অধ্যয়নপর না হয় তাহা হইলে তাহাকে নামধারক বিপ্র বলা হইবে (ব্যা. স্মৃ ৪।৪২-৪৩)। যদি জিজ্ঞাসা কর

কূর্মপুরাণে সংস্কাররহিত নামধারক বিপ্রের মরণান্ত অশৌচ বিহিত হইয়াছে—দক্ষও বলিয়াছেন ব্যাধিত, কদর্য, সর্বদা ঋণগ্রস্ত ক্রিয়াহীন, মূর্খ, স্ত্রীজিত, ব্যসনাসক্তচিত্ত, নিত্যপরাধীন, শ্রদ্ধাত্যাগবিহীন ব্রাহ্মণের অশৌচ মরণান্ত হইবে, তাহার শুদ্ধি কদাপি ঘটিবে না (দ. স্মৃ. ৬।৯-১১)—তাহা হইলে দশাহাশৌচ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিব, এই সকল বচনের দ্বারা যাবজ্জীবনাশৌচ বিধান করা হয় নাই – ইহারা কেবল নিন্দার্থবাদ মাত্র। অন্যথা পরাশরবচনের সহিত ইহাদের বিরোধ উপস্থিত হয়।

বীরমিত্রোদয়ে সগুণনির্গুণভেদে অশৌচব্যবস্থা

দক্ষ বলিলেন—'অগ্নিবেদ সমন্বিত ব্রাহ্মণ একাহে শুদ্ধ হইবেন। হীন ও হীনতরের জন্য ত্র্যহ ও চতুরহ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।' ইহার অর্থ—শ্রৌতাগ্নি ও মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদাধ্যয়ন – এই উভয়ান্বিত ব্রাহ্মণের জন্য একাহ ব্যবস্থা। এই দুইটির মধ্যে একতর শূন্য হইলেই তাহাকে হীন বলা হইবে। হীন অর্থাৎ কেবল শ্রৌতাগ্নিমান অথবা কেবল মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদাধ্যয়নবান্। এইরূপ হীনের জন্যই ত্র্যহ ব্যবস্থা। এই দুইটি শূন্য হইলে তাহাকে হীনতর বলা হইবে। হীনতর অর্থাৎ কেবল স্মার্তাগ্নিমান্। তাহার জন্য চতুরহের ব্যবস্থা।

যদিও মন্ত্রমাত্রবেদ এবং স্মার্তাগ্নি—এই উভয়বান্ হীনতর, সুতরাং তাহার জন্য চতুরহ ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত তথাপি 'বেদাগ্নিসংযুক্ত ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্রে শুদ্ধ হইবে, অগ্নিহীন ব্রাহ্মণ পঞ্চাহে এবং ব্রাহ্মণব্রুব দশাহে শুদ্ধ হইবে'—এই বৃহস্পতিবচন অনুসারে বেদাগ্নিযোগে ত্র্যহবিধান করা হইয়াছে। অগ্নিহীন বেদবিদের জন্য পঞ্চাহবিধান এবং বেদ পদটি কেবল মন্ত্রমাত্র পদ। অগ্নিপদটি যেহেতু কেবল স্মার্তাগ্নিমাত্র পদ সুতরাং মন্ত্রমাত্র বেদ এবং স্মার্তাগ্নিমান ব্রাহ্মণের জন্য ত্র্যহবিধানই যুক্তিযুক্ত। কেবল মন্ত্রমাত্রবিদ্ ব্রাহ্মণের জন্য পঞ্চাহ ইহাই সিদ্ধ হইল।

'অগ্নিবেদসমন্বিত ব্রাহ্মণ একাহে শুদ্ধ হইবে। কেবল বেদব্রাহ্মণ ত্র্যহশৌচপ্রাপ্ত হইবে এবং নির্গুণ ব্রাহ্মণের জন্য দশরাত্রের বিধান'—এই পরাশরবচনে কেবল বেদগ্রহণের দ্বারাই শ্রৌতাগ্নিও গৃহীত হইয়াছে। ন্যায়ের তুল্যতাই ইহার হেতু। 'নির্গুণ দশদিনে শুদ্ধ হইবে'—এইস্থলে 'নির্গুণ' পদের দ্বারা স্মার্তাগ্নি ও মন্ত্রমাত্র বেদযোগাত্মক গুণাভাবও বুঝিতে হইবে। শ্রৌতাগ্নি এবং মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক

গুণযোগাভাবপর বিষয়ে গ্রহণ করিলে মনু-দক্ষোক্ত চতুরহ এবং বৃহস্পত্যুক্ত পঞ্চাহ এই পক্ষদ্বয়ের নির্বিষয়তাপত্তি উপস্থিত হয়। জাবালির বচনে একটি গুণ হইল স্মার্তাগ্নিমাত্র। দুইটি গুণ হইল স্মার্তাগ্নি এবং মন্ত্রমাত্র বেদ। তিনটি গুণ হইল মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ বা মন্ত্রমাত্র বেদের সহিত শ্রৌতস্মার্তাগ্নি। সার্থক বেদ শ্রৌতস্মার্তাগ্নি এবং স্বাশ্রমবিহিত যাবতীয় ক্রিয়াযোগ হইলে—'সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্তিতাঃ'। দেবলও এই কথা বলিয়াছেন—যে ব্রাহ্মণ সাঙ্গ, সকল্প এবং সরহস্য বেদের অর্থ জ্ঞাত হইয়া ক্রিয়াবান্ হয় তাহার সূতক হয় না। পরাশরও এই কথাই বলিয়াছেন—যে ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, নিত্য বেদ পাঠ করে, সতত বৈশ্বদেবের অনুষ্ঠান করে তাহার সূতক নাই। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—জাবালিবচনে একটি গুণ হইল বিজ্ঞাতার্থ সাঙ্গবেদমাত্র, দুইটি গুণ হইল তাদৃশ বেদ এবং স্মার্তাগ্নি, তিনটি গুণ হইল তাদৃশবেদ এবং শ্রৌত ও স্মার্তাগ্নি। সর্বযোগের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বৃহস্পতিবচনে অগ্নিপদ কেবল স্মার্তাগ্নিমাত্রপর। অর্থাঙ্গাদিহীন সকল বেদমাত্রবিদ্ ব্রাহ্মণের পঞ্চাহে বিশুদ্ধি। এইরূপে গুণত্রয়বান্ ব্রাহ্মণের একাহ এবং একগুণবান ব্রাহ্মণের চতুরহ বিধায়ক জাবালিবচনের সহিত অবিরোধ ঘটে। এইরূপ বেদৈকদেশবিৎ মাত্রের ষড়হাশৌচ হইলে দক্ষোক্তি ষড়হের অন্যত্র চরিতার্থতা না হওয়ায় গুণহানি প্রযুক্তত্ব সিদ্ধি হইল।

কল্পতরুকার কিন্তু পরাশরবচনে অগ্নিপদকে শ্রৌতাগ্নিপর বলিয়াছেন এবং শঙ্খবচনে ও বৃহস্পতিবচনে অগ্নিপদকে স্মার্তাগ্নি পদ বলিয়াছেন। দক্ষবচনে 'হীন' এই পদের এবং পরাশরবচনে 'কেবল বেদ' এই অংশের শ্রৌতাগ্নিশূন্য স্মার্তাগ্নিমান্ বেদৈক দেশাধ্যায়ী ইহাই অর্থ, অগ্নিমাত্র শূন্য নহে। কারণ বৃহস্পতি অগ্নিহীনের জন্য পঞ্চাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হীনতর শব্দের অর্থ অসম্পূর্ণ বেদাধ্যায়ী।

এইরূপে অগ্নিমান্ ক্ষত্রিয়ের দশাহ এবং অগ্নিমান বৈশ্যের দ্বাদশাহ অশৌচ হইবে॥ পরাশর বলিলেন—স্বকর্মনিরত ক্ষত্রিয় দশাহে শুচি হইবে। স্বকর্মনিরত বৈশ্য দ্বাদশাহে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ক্ষত্রিয়ের দশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রের ত্রিংশদ্দিন অশৌচ হইবে। ন্যায়বর্তী শূদ্রের ইহার অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চদশাহ বা অর্ধমাস অশৌচ বিহিত হইয়াছে। ন্যায়বর্তী শব্দের অর্থ শ্রদ্ধার সহিত দ্বিজ-শুশ্রূষাপর পঞ্চযজ্ঞাদি শূদ্রবিহিত ক্রিয়াবান শূদ্রের পঞ্চদশাহশৌচ।

কেহ কেহ সকল বর্ণের জন্ম দশাহশৌচ বিধান করিয়াছেন। দেবল বলিলেন—কেহ কেহ কর্মের ক্ষয় দেখিয়া নিধন এবং প্রসবে সর্বত্রই দশরাত্র অশৌচ বিধান করিয়াছেন। স্মৃত্যন্তরেও বলা হইয়াছে, শাতাতপের মতে সকল বর্ণেরই সূতকে এবং মৃতকে দশাহেই শুদ্ধি হইবে।

এই অশৌচসঙ্কোচ সগুণদের ও অশুচি পুত্রাদির অসম্পর্কেই বুঝিতে হইবে। পরাশর বলিয়াছেন কি জন্মে কি মরণে বিপ্র সম্পর্কের দ্বারাই দূষিত হয়। সম্পর্ক বিনিবৃত্ত হইলে অশৌচও নাই, সূতকও নাই। অতএব সগুণদেরও সম্পর্ক থাকিলে দশাহাদি অশৌচ বাধিত হইবে না। সেই সম্পর্কনিবৃত্ত্যাশৌচ নিবৃত্তিও সেই সেই কর্মে বুঝিতে হইবে।

সর্বত্রাশৌচ নিবৃত্তি কিন্তু কি সগুণ কি নিগুর্ন সকলেরই দশাহাদির পরে ঘটিবে। এইরূপে শাবাশৌচ দশাহ ইত্যাদি বচনই বিধায়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাধকের অনুপপত্তিনিবন্ধতাহেতু যে যে স্থলে বাধের অভাব হয় কেবল সেই সেই স্থলেই বিশেষ বচনের দ্বারা সামান্য বচনকে বাধিত করিতে হইবে—নাধিকং কিঞ্চিৎ। অতএব বিশেষবচনের দ্বারা কতটা বাধিত হইবে এই অপেক্ষায় অপেক্ষিত বিশেষ সমর্পণক্ষম—অগ্নিবেদ সমন্বিত ইত্যাদি বাক্যবিশেষ দেখিতে পাওয়া যাওয়ায় অগ্নিহোত্রাদি কর্মে এবং স্বাধ্যায়নাদি কর্মেই এই বিশেষ বিধি ব্যবস্থিত হইবে, দানাদি কর্মে নহে। অতএব সপিণ্ডের পক্ষে শাবাশৌচ দশাহই বিহিত হইয়াছে। অস্থি সঞ্চয়নের পূর্বে ত্র্যহ বা কুশূল ধান্যক, কুম্ভী ধান্যক, ত্র্যৈহিক এবং অশ্বস্তনিক—এই চতুর্বিধ গৃহস্থবিষয়ক। যে ব্রাহ্মণ দশাহোপযোগী ধান্য সঞ্চয় করে তাহার নাম কুশূল ধান্যক। তাহার দশাহ অশৌচই হইবে। যাহার চতুরহ পর্যন্ত ধান্য সঞ্চিত আছে তাহার নাম কুম্ভী ধান্যক। তাহার চতুরহই অশৌচ হইবে। এইরূপ তিনদিন পর্যন্ত যাহার ত্র্যহ এবং একাহ পর্যন্ত যাহার তাহার একাহ অশৌচ। যাহার একাহ পর্যন্ত নাই সেইরূপ অশ্বস্তনিকের পক্ষে সদ্যঃশৌচ। ইহাই মিতাক্ষরাকারের অভিমত।

হারলতাকারও বলিয়াছেন—হোম এবং অধ্যাপনার্থই এই অশৌচসঙ্কোচ—প্রতিষিদ্ধ সন্ধ্যা, পঞ্চমহাযজ্ঞাদির উপযোগার্থ নহে। ছন্দোগ পরিশিষ্টেও উক্ত হইয়াছে—সূতকের সন্ধ্যাদি কর্মের ত্যাগ বিহিত হইয়াছে। শ্রৌতকর্মের মধ্যে শুষ্কান্ন বা ফলের দ্বারাও হোম করা কর্তব্য। এইস্থলে হোমে অশৌচসঙ্কোচ

কিন্তু সন্ধ্যাদিবিষয়ে নহে, ইহাই প্রতীত হয়। পারস্করও সূত্র করিলেন— 'নিত্যানি নিবর্ত্তেরন্ বৈতান বর্জন্ ইতি'—বৈতান ভিন্ন নিত্যকর্ম নিবৃত্ত হইবে। বৈতান শব্দের অর্থ শ্রৌত হোম। মনুও হোম ক্রিয়ার জন্য অশৌচাভাব দেখাইয়াছেন। শঙ্খলিখিত বলিলেন - অগ্নিহোমের জন্য স্নানোপস্পর্শন দ্বারাই পুত্র জননে) পিতা শুচি হইবেন। এইস্থলে অগ্নিহোমের জন্য এইরূপ বলায় ক্রিয়ান্তরে পিতার অশৌচ থাকিবে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এই জন্যই গৌতম সূত্র করিলে—সদ্যঃশৌচং রাজ্ঞাং কার্যাবিরোধায় ব্রাহ্মণানাং চ স্বাধ্যায়া নিবৃত্ত্যর্থম্ ইতি'—রাজকার্যের অবিরোধের জন্য রাজার 'সদ্যঃশৌচ, স্বাধ্যায় যাহাতে নিবৃত্ত না হয় তাহার জন্য ব্রাহ্মণের সদ্যঃশৌচ বিহিত হইয়াছে।

এইরূপ বহুতর বচনের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে কেবল হোম ও অধ্যাপনের জন্য অশৌচসঙ্কোচ বিহিত হইয়াছে।

সর্বাশৌচ নিবৃত্তি কিন্তু সগুণ নির্গুণ সকলেরই দশাহের পরে হইবে। পারস্কর-গৃহ্য ব্যাখ্যাতা হরিহর মিশ্রও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আচার্যচূড়ামণি প্রভৃতি বলেন ছন্দোগ পরিশিষ্ট পারস্কর শঙ্খলিখিত ও গৌতম-বচনে হোমাধ্যাপনের জন্যই সদ্যঃশৌচ সিদ্ধ হওয়ায় ত্র্যহাদির মধ্যেও হোমাধ্যাপনা প্রতিপন্ন হওয়ায় সন্ধ্যা পঞ্চমহাযজ্ঞাদি বিষয়েই ত্র্যহাদি অশৌচ বলিতে হয়। সেই অনুসারে ত্র্যহাদির পরই সন্ধ্যাদির উপযোগসিদ্ধি নিষ্প্রত্যূহ হয়। 'হোমাধ্যাপনার্থ সদ্য শৌচাভিধান সর্বগুণযোগই সদ্যঃশৌচপর। অন্যসকলের পক্ষে কিন্তু ত্র্যহাদির পরই হোমাধ্যাপন বিহিত'—এই কথাও বলা যায় না। কারণ, 'জন্ম ও মৃত্যুতে বিতানকর্মের ত্যাগ নাই। কেবল শালাগ্নিতে অন্য গোত্রজ দ্বারা হোম করাইবে' ইত্যাদি জাবালীয় বচনানুসারে বিতানকর্মের অত্যাগকালে স্বয়ং স্মার্তকর্মত্যাগ বিধানের সদ্যঃশৌচবিষয়তা অনুপপন্ন হয়। 'ত্র্যহাদি অশৌচী ত্র্যহাদির পর দশাহের মধ্যে বিতানকর্ম স্বয়ং করিবে কিন্তু স্মার্তাগ্নি হোম চতুরহের পর ও দশাহের মধ্যে অন্য গোত্রজলাভে তাহার দ্বারা, তদলাভে স্বয়ং করিবে'—জাবালীয় বচনের এইরূপ অর্থ কল্পনা করাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, ইহা কল্পনামাত্রই। ত্র্যহাদির পর বিতানকর্মের ন্যায় চতুরাহাদির পর স্মার্তাগ্নি হোমের স্বয়ং অনুষ্ঠান সম্ভব হইলে তাহা স্বয়ং না করা অনুচিত হইবে। অতএব একাহ ত্র্যহাদি অশৌচের মধ্যেও শ্রৌতাগ্নিহোম স্বয়ং করিবে কিন্তু স্মার্তাগ্নি হোম চতুরহের মধ্যে অন্য গোত্রজদ্বারা করাইবে।

সন্ধ্যা পঞ্চমহাযজ্ঞাদি একাহ ত্র্যহাদির মধ্যেই ত্যাগ করিবে। তাহার পর কিন্তু সর্বাশৌচ নিবৃত্তি হওয়ায় শ্রৌতস্মার্তাগ্নিহোম এবং সন্ধ্যা পঞ্চমহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান স্বয়ং করিবে ইহাই সিদ্ধ হইল।

'সন্ধ্যা পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতি নিত্যস্মৃতিকর্ম অশৌচের মধ্যে পরিত্যাগ করিবে। দশাহ অন্ত হইলে পুনরায় ইহাদের অনুষ্ঠান করিবে'—এই জাবালীয় বচনানুসারে একাহাদি অশৌচ বিগম হইলেও 'দশাহের মধ্যে সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠান করিবে না'— এই কথাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে সমানোদক মরণাদি ত্র্যহাশৌচের পরও দশাহের মধ্যে সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ কিন্তু মহাগুরুনিপাতে বর্ষপর্যন্ত দৈবপিত্র্যকর্ম নিষিদ্ধ। তাহারই প্রতিপ্রসবরূপে জাবালীয়বচনে 'দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া'—এই কথা বলা হইয়াছে। পুনরায় 'সদ্যঃশৌচ, একাহ, ত্র্যহ তথা চতুরহ' ইত্যাদি দক্ষবচনে দশাহাদির সহিত সদ্যঃশৌচাদির একত্র পাঠ থাকায় একাহাদির দ্বারাও সর্বাশৌচ নিবৃত্তি প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই অশৌচসঙ্কোচ যুগান্তরবিষয়ক যেহেতু 'বৃত্ত স্বাধ্যায় সাপেক্ষম্ অঘসঙ্কোচনং তথা' ইত্যাদি বচনের দ্বারা কলিযুগে এই অশৌচসঙ্কোচ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। হারীতও বলিয়াছেন 'দশাহ এব বিপ্রস্য সপিণ্ড মরণে সতি। কল্পান্তরাণি কুর্বাণঃ কলৌ ভবতি কিল্বিষী।'

মাধবও এই কথাই বলিয়াছেন।

শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন ঃ সগুণাশৌচ

যদি বলা হয় দক্ষোক্ত সদ্যঃশৌচাদি অত্যন্ত সগুণাদিপর নহে—বালাদি প্রভৃতির অশৌচ দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্মাস গর্ভস্রাব বিষয়ে চতুরহ, দুই বৎসরের পর উপনয়নের পূর্বপর্যন্ত ক্ষত্রিয় বালকের বিষয়ে ষড়হ, যেইস্থলে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র অশৌচ সেইস্থলে শূদ্রের দ্বাদশাহ, ক্ষত্রিয়ের ষড়হ ও বৈশ্যের নবাহ হারলতাধৃত বচনানুসারে বিহিত হইয়াছে—দক্ষোক্ত সদ্যঃ, একাহ, ত্র্যহ, চতুরহ, ষড়হ, দশাহ, দ্বাদশাহ, পক্ষ মাস ও মরণান্ত এই দশবিধ অশৌচ ব্যবস্থা পূর্বোক্ত স্থলগুলিতেই প্রযোজ্য হইবে, অত্যন্ত সগুণাদি বিষয়ে নহে—তাহা হইলে বলিব, তাহা হইতে পারে না। উপন্যাস অর্থাৎ উদ্দেশক্রমে অর্থাৎ নাম মাত্রের সংকীর্তনের দ্বারা ঐগুলির পৃথক্ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দক্ষ নিজেই সগুণ নির্গুণ ভেদে ঐ সকল অশৌচের বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কারণেই বাচস্পতি মিশ্র গুণহানি

অনুসারে ষড়াহাদি ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। রত্নাকর দশমাশৌচ মরণান্তের কথা বলিয়াছেন যাহা জননাশৌচ ও মরণাশৌচ হইতে পৃথক্। কূর্ম পুরাণ ও রত্নাকরের কথাই সমর্থন করিয়াছেন – ক্রিয়াহীন, মূর্খ, মহারোগী এবং যথেচ্ছাচারীর জন্য মরণান্ত অশৌচ বিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ গায়ত্রী রহিতকেই মূর্খ বলিয়াছেন। রুদ্রধর সার্থ গায়ত্রী রহিতকেই মূর্খ বলিয়াছেন। দক্ষবচনে দশাহাদির উল্লেখ থাকায় সগুণদেরও সদ্যঃশৌচ প্রভৃতি স্থলে সর্বাশৌচ নিবৃত্তি বলিয়াই অর্থ করিয়াছেন। যেইস্থলে গুণবত্তা প্রযুক্ত অশৌচ নিবৃত্তি, সেইস্থলে সর্বাশৌচ নিবৃত্তিই বুঝিতে হইবে। কেবল হোমাধ্যাপনমাত্রের জন্য নহে। ইহাদের মত বিশেষ চিন্তা করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ জাবালাদির বচনের সহিত ইহাদের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ত্র অর্থাৎ জন্ম ও মৃতুতে সপিণ্ডগণের দশাহ অশৌচ হইবে। কেবল অগ্নিহোত্রের জন্য সাগ্নিক, স্নান ও আচমনের অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তির দ্বারাই শুদ্ধি। নিরগ্নি ও সাগ্নি উভয়ের জন্যই সপিণ্ডমরণে বা সপিণ্ডজননে দশাহশৌচ বিহিত হইয়াছে। সাগ্নিকের পক্ষে কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রের জন্যই দুইবার স্নান ও দুইবার আচমনের দ্বারা তাহার একাহের পর শুদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্য কার্যে সাগ্নিক ও নিরগ্নিক উভয়েই দশাহ পর্যন্ত তুল্যভাবে অশুদ্ধ থাকিবে।

এইরূপ অর্থ না করিলে নিরগ্নি ও সাগ্নি বিষয়ে বাক্যভেদ হয় বলিয়া গৌরব উপস্থিত হয়। সম্বর্ত বলিলেন—শুষ্কান্ন অর্থাৎ শক্তুলাজাদি বা ফলের দ্বারাও হোম করিতে হইবে। মরণাশৌচ বা জাতাশৌচের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ বিধান করিবে না। দশাহের পর ধর্মবিৎ বিপ্র সম্যক্ অধ্যয়ন করিবেন।

অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারাই অশৌচের মধ্যে হোম করিবেন দশাহের পর তাঁহারাই পঞ্চযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন। অর্থাৎ অত্যন্ত সগুণদেরও সদ্যঃশৌচাদির স্থলে সর্বাশৌচ নিবৃত্তি ঘটে। কেবল হোমকার্যের জন্যই একাহাদির স্থলে ব্যবস্থিতাশৌচনিবৃত্তি ঘটে।

গৌতম বলিলেন—দশরাত্রির পর জনন-মরণাদির অশৌচবার্তা শ্রবণে পক্ষিণী অশৌচ হইবে (পক্ষিণী = দ্বাবহ্নাবেকরাত্রিশ্চ পক্ষিণীত্যভিধীয়তে)। দশাহন্তর অশৌচবার্তা শ্রবণ করিলে ত্র্যহাশৌচই বিহিত হইয়াছে। গৌতমের এই পক্ষিণীব্যবস্থা চতুরহ, পঞ্চাহাশৌচি সগুণবিষয়ক। যদি চতুরহ পঞ্চাহেই সগুণদের সর্বাশৌচনিবৃত্তি হয় তাহা হইলে 'দশরাত্রির পর' এই অংশটি অনুপপন্ন হইয়া

পড়ে। সুতরাং একাহ, ত্র্যহ, চতুরহাদি ব্যবস্থায় সর্বাশৌচের নিবৃত্তি ঘটে না। কর্মবিশেষের জন্যই তাহাদের শুদ্ধি ব্যবস্থিত। দশাহই হইল সর্বাশৌচনিবৃত্তির অন্তিম দিবস। এই কারণেই গৌতমবচনে 'দশাহের পর' এইকথা সগুণবিষয়েও বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেবলের—'আশুচ্যং দশরাত্রং তু সর্বেষাম্ অপরে বিদুঃ। নিধনে প্রসবেচৈব পঞ্চন্তঃ কর্মণঃ ক্ষয়ম্॥'—এই উক্তি এবং অঙ্গীরার—'সর্বেষাম্ এব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা। দশাহাৎ শুচিরেতেষাম্ ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ'॥—এই বচনে সগুণবিষয়কত্বহেতু দশাহাদিতে ক্ষত্রিয়াদির সর্বাশৌচ নিবৃত্তি ঘটে না। কর্মবিশেষের জন্যই এই অশৌচনিবৃত্তি ব্যবস্থিত।

দশাহ অতীত হইলে যথাবিধি শৌচাদিকৃত্য সমাপন করিয়া ভরত দ্বাদশাহাদিকাদি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, ভরত সাগ্নিক সুতরাং সগুণক্ষত্রিয় ছিলেন। আদিকাণ্ডে রামাদির বিবাহ প্রস্তাবে 'ত্রীণগ্নীংস্তে পরিক্রম্য তা উদূহুর্বধূঃ পৃথক্' এইরূপ বলা হইয়াছে। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবণীয়াগ্নি—ইহাই হইল ত্রিবিধ অগ্নি। সাগ্নিকেরাই এই ত্রিবিধ অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকে। ভরত সাগ্নিক ছিলেন বলিয়াই দশাহে অশৌচান্তক্রিয়া করিয়াছিলেন। এই শুদ্ধিও সর্বাশৌচ নিবৃত্তিপর নহে। শূদ্রের পক্ষেও ব্রাহ্মণের সেবকান্তরাভাবে ব্রাহ্মণ সেবার জন্যই দশাহের পর শুদ্ধি বিহিত হইয়াছে। 'সূতকে এবং মৃতকে শূদ্র একমাসেই শুদ্ধ হইবে।' এই অঙ্গীরাবচনে 'একমাসেই' এইরূপ বলায় সর্বাশৌচ নিবৃত্তি একমাসেই হইবে। সুতরাং সগুণগণের সেই সেই কর্মেই অশৌচের সঙ্কোচ। 'সর্বাশৌচের নিবৃত্তি দশাহের পর'—এই হারলতা, মিতাক্ষরা প্রভৃতির উক্তিই 'সাধু' বলিয়া বিবেচিত হয়।

বস্তুতঃপক্ষে হেমাদ্রি ও পরাশর ভাষ্যোদ্ধৃত আদিত্যপুরাণের বচনের দ্বারা বৃত্তাদি নিমিত্তক অশৌচসঙ্কোচ কলিযুগে নিরস্ত। বৃত্তাদিনিমিত্তক অর্থাৎ সগুণত্ব-নিমিত্তক। বৃত্ত শব্দের অর্থ চরিত্র বা সদাচার। আদিত্যপুরাণের বচন নিম্নোক্ত-রূপঃ কন্যানাম্ অসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষম্ অঘসঙ্কোচনং তথা॥ প্রায়শ্চিত্তঃ বিধানং চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্। সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ॥ দত্তৌ রসে তরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। শূদ্রেষু দাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥ ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ। ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্তাদিক্রিয়াপিচ। ভৃগ্বগ্নি মরণঞ্চৈব বৃদ্ধাদি মরণং তথা

ইত্যাদীনি অভিধায় এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্তিতানি কর্মাণি ব্যবস্থাপূর্বং বুধৈঃ ॥

পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য

একাদশদিনে একোদ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণেরই সমান। মরীচি বলিলেন—অশৌচান্তে পিণ্ডদান সম্যক্‌রূপে সমাপন করিতে হয়। তাহার পর শ্রাদ্ধদান করিবে। সর্ববর্ণের পক্ষেই এই বিধি। ইহার অর্থ— অশৌচানন্তর একাদশদিনে ব্রাহ্মণ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। 'একোদ্দিষ্ট একাদশদিনে করিবে' এই বিধি ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

যদি বল, তাহা নহে, অশৌচ সমাপ্ত্যনন্তর একোদ্দিষ্টবিধি সকল বর্ণেরই সমান, এইরূপ অর্থ হইবে না কেন? একাদশদিনের অধিক কালাশৌচে শুদ্ধির অভাববশতঃ ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের পক্ষে একাদশদিনে একোদ্দিষ্ট কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 'শুচিনা কর্ম কর্তব্যম্' এই বিধান অনুসারে শুচিতাকেও কর্মের অঙ্গই বলা হইয়াছে। বিষ্ণুস্মৃতিও 'অথ অশৌচাপগমে' এইরূপ বলিয়াই একোদ্দিষ্টের কথা বলিয়াছেন। তাহা হইলে বলিব—'আদ্যশ্রাদ্ধম্ অশুদ্ধোঽপি কুর্যাৎ একাদশেঽহনি। কর্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেবস॥'—এই শঙ্খলিখিত বচনানুসারে অশৌচের মধ্যে একাদশদিনে একোদ্দিষ্ট বিধান করা হইয়াছে। যদি বল, না তাহা হয় নাই, মাতার মৃত্যুর অশৌচমধ্যে যদি পিতার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে মাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ একাদশদিনে অশুদ্ধ থাকিলেও করিবে—এই বিষয়ান্তরে শঙ্খবচনের সার্থকতা। আর যে পৈঠীনসি বলিয়াছেন—'একাদশেঽহ্নি যৎ শ্রাদ্ধং তৎ সামান্যম্ উদাহৃতম্। চতুর্ণামপি বর্ণানাং সূতকং তু পৃথক্ পৃথক্॥' তাহার অর্থ এই যে অশৌচানন্তর দিনে যেই শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে তাহা চারিবর্ণেরই সাধারণ, কেবল ব্রাহ্মণের নহে। যদি জিজ্ঞাসা কর, এইরূপ অর্থ করিলে একাদশাহ শব্দের উপপত্তি কিরূপে ঘটে? তাহার উত্তরে বলিব 'লক্ষণার দ্বারা একাদশাহ শব্দের অশৌচানন্তর দিনপরত্ব রূপে উপপত্তি হইবে।'

এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইতেছে—একাদশাহকাল বিশিষ্ট একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ চারিবর্ণের জন্যই বিধান করা হইয়াছে। 'ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থঃ' এই ন্যায় অনুসারে একাদশাহ শব্দের লক্ষণার দ্বারা অশৌচানন্তর দিনপরত্ব উপপন্ন হয় না। যেহেতু মুখ্যার্থ থাকিলে বৃত্ত্যন্তর কল্পনা অন্যায্য সুতরাং একাদশাহেই ক্ষত্রিয়াদিও একোদ্দিষ্ট

শ্রাদ্ধ করিবেন। যদি বল একাদশদিনে ক্ষত্রিয়াদির শুদ্ধির অভাববশতঃ শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, তাহা হইলে বলিব—'কর্তৃত্বাৎ কালিকী শুদ্ধিঃ'—এই বচনানুসারে ক্ষত্রিয়াদিরও তাৎকালিকী শুদ্ধি বর্তমান রহিয়াছে। আর যে শঙ্খবচনে বিষয়-বিশেষে তাৎপর্য বলা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ সেই স্থলেও শুদ্ধির অভাব বর্তমান রহিয়াছে। শুদ্ধির অভাব উভয়পক্ষেই সমান। সুতরাং সামান্যভাবে প্রবৃত্ত শঙ্খবচনে বিনা কারণে বিষয়বিশেষপরস্বরূপে সঙ্কোচসাধন সঙ্গত নহে। আর বিষ্ণু 'অথা শৌচাপগমে' এই সামান্যভাবের উপক্রম করিয়া একোদ্দিষ্ট বিধান করিয়াছেন বলিয়া যে অশৌচানন্তরই সকলের পক্ষে একোদ্দিষ্ট কর্তব্য এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে। দশাহাশৌচী ব্রাহ্মণ বিষয়স্বরূপে বিষ্ণুবচনের উপপত্তি হইতে পারে।

অতএব একাদশাহেই ক্ষত্রিয়াদিও একোদ্দিষ্ট করিবেন—এইরূপ উক্তিকেই সুষ্ঠু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে (আচার কাণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়)। মাধবের মতে নৃপাদির অসাধারণ কৃত্যবিষয়েই অশৌচাভাব বিহিত হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে নৃপাদিরও দ্বাদশাহাদি পর্যন্ত অশৌচ থাকিয়াই যাইবে। অশৌচ-সঙ্কোচ দ্বারা সর্বাশৌচ নিবৃত্তি ঘটে না, কেবল যাহার যেই বিষয়ের জন্য অশৌচসঙ্কোচ বিহিত হইয়াছে কেবল সেই বিষয়েই অশৌচসঙ্কোচ বুঝিতে হইবে।

ইহার পর দ্বিজেতরগণের অশৌচ ব্যবস্থা। গৌতম তাঁহার ধর্মসূত্রে বলিলেন—'মাসং শূদ্রস্য'—জননে ও মরণে, সপিণ্ডগণের একমাস অশৌচ হইবে। গৌতম ধর্মসূত্রের টীকাকার উশনার মত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—'সচ্ছূদ্রাণাম্ অর্ধমাসম্ ইতি'—সৎ শূদ্রগণের সপিণ্ডমরণে অর্ধমাস অশৌচ হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'ক্ষত্রিয়স্য দশাহানি বিশাং পঞ্চাশৈব তু। ত্রিংশৎ দিনানি শূদ্রস্য তদর্ধং ন্যায়-বর্তিনঃ।' বীরমিত্রোদয়কার 'ন্যায়বর্তিনঃ' এই কথাটির অর্থ করিয়াছেন—'শ্রদ্ধয়া দ্বিজশুশ্রূষা পঞ্চযজ্ঞাদি শূদ্রবিহিত ক্রিয়াবতঃ।' 'শূদ্রস্য পঞ্চদশাহাশৌচম্' শ্রদ্ধার সহিত দ্বিজশুশ্রূষা এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি শূদ্রবিহিত ক্রিয়াবান্ শূদ্রের পঞ্চ-দশাহাশৌচ হইবে। যাহারা ত্রিবর্ণের পরিচর্যা করিয়া বৃত্তি লাভ করে তাহারাই সৎ শূদ্র। ত্রিবর্ণের পরিচর্যাই তাঁহাদের উত্তম বৃত্তি। মনু বলিলেন—'শুদ্ধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেনঃ ভূমিপঃ। বৈশ্য পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধতি'॥ ইহার পর সকল সংহিতাকারই মনুবচনের অনুবর্তন করিলেন। নির্ণয়সিন্ধুকার

অঙ্গীরার বচন বলিয়া একটি বচন উদ্ধৃত করিলেন—'সর্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা। দশাহাৎ শুদ্ধিরেতেষাম্ ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ'॥ কি জননে, কি মরণে সকল বর্ণেরই দশাহে শুদ্ধি হইবে ইহাই শাতাতপ বলিয়াছেন। নিবন্ধকার দেবলের বচন বলিয়া আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—'আশুচ্যং দশরাত্রংতু সর্বেষাম্ অপরে বিদুঃ। নিধনে প্রসবেচৈব পশ্যন্তঃ কর্মণঃ ক্ষয়ম ॥' নিধনে ও প্রসবে সকলেরই দশরাত্র অশৌচ হইবে। কর্মের ক্ষয় দেখিয়া অপরে এই কথা বলিয়াছেন। ইহার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া নিবন্ধকার হারলতার মত উদ্ধৃত করিতে গিয়া বলিলেন—অত্যন্তোৎকৃষ্টস্ত কর্মহানৌ পীড়াবতো বিপ্র-পরিচর্যাপরস্ত শূদ্রস্ত দশরাত্রম'—অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিপ্রপরিচর্যাপর শূদ্র যদি পীড়িত হয় এবং সেইকারণে যদি কর্মহানির আশঙ্কা উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই শূদ্রের দশরাত্র অশৌচ হইবে।

আবার তথাকথিত সৎশূদ্রগণের মধ্যে অনেকে আপনাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন এবং পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া দ্বিজত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়োচিত আচার প্রতিপালন করিতেছেন। কেহবা এইরূপ প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান করেন নাই এবং উপ-বীতাদি গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত আচারও প্রতিপালন করিতেছেন না। ক্ষত্রিয়ের সপিণ্ডাদি মরণে দশাহাশৌচ মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিহিত করিয়াছেন। এইরূপে শূদ্রগণের জন্য ধর্মশাস্ত্রকারগণ নানারূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেহবা এক মাস, কেহবা অর্ধমাস, কেহবা দ্বাদশাহ, কেহবা দশাহ। আবার সগুণ নির্গুণভেদে ক্ষত্রিয়গণের জন্য অশৌচসঙ্কোচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তথা-কথিত শূদ্রগণ যথার্থ ক্ষত্রিয় কিনা এইস্থলে সেই বিচার আমরা করিব না। পূর্বসূরিগণ সেই বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত বঙ্গদেশীয় সৎশূদ্রগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে শূদ্রগণের অশৌচের এই বিভিন্ন পক্ষ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যাঁহারা সৎশূদ্র বলিয়া নিজেদের বিবেচনা করেন না শাস্ত্রকারগণ সকলেই তাঁহাদের জন্য মাসাশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বিষয়ে ধর্মসূত্রকার, ধর্ম-সংহিতাকার এবং নিবন্ধকারগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

সৎশূদ্রগণের জন্য কেহ কেহ অর্ধমাসাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়া উপবীতাদি ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত

আচার প্রতিপালন করিতেছেন তাঁহাদের দ্বাদশাশৌচও সুব্যবস্থিত। এই বিষয়েও কোন মতভেদের কারণ দেখা যায় না।

যে সকল সৎ শূদ্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান করেন নাই এবং উপবীতাদি ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত আচারও প্রতিপালন করিতে চান না তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ অশৌচব্যবস্থা সঙ্গত হইবে তাহাই বিচার্য।

যাঁহারা আপনাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন না সেই সকল সৎশূদ্রের পক্ষে পঞ্চদশাহ বা অর্ধমাস অশৌচ ব্যবস্থাই সঙ্গত হইবে। কিন্তু যাঁহারা আপনাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া বিবেচনা করেন কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত আচার প্রতিপালন করেন না, তাঁহাদের কি হইবে?

শাস্ত্রকারগণের মধ্যে পরাশর নামধারক বিপ্রের জন্য দশাহাশৌচ বিধান করিয়াছেন—'জন্মকর্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জিতঃ। নামধারক বিপ্রস্তু দশাহং সূতকী ভবেৎ।'—গর্ভধানাদি সংস্কার রহিত সন্ধ্যোপাসনাদি বর্জিত নামধারক বিপ্রের দশাহাশৌচ হইবে। ব্যাস নামধারক বিপ্রের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন— ব্রহ্মবীজ সমুৎপন্নো মন্ত্রসংস্কার বর্জিতঃ। জাতির্মাত্রোপজীবী চ সর্ভবেন্নামধারকঃ— ব্রহ্মবীজ হইতে সমুৎপন্ন মন্ত্রসংস্কারবর্জিত, জাতিমাত্রোপজীবী, নির্গুণ ব্রাহ্মণ ক্রবকেই নামধারক বিপ্র বলা হইয়াছে। এইরূপ নামমাত্রোপজীবী ক্ষত্রিয়ের জন্যও দ্বাদশাহাশৌচ বিহিত হইতে পারে। সগুণ, সাগ্নিক ক্ষত্রিয়ের জন্য পরাশর কল্পান্তরে অর্থাৎ কলি ভিন্ন অন্য যুগে দশাহাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন— 'ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্মনিরতঃ শুচি'—সগুণ অর্থাৎ বেদাগ্নিমান ক্ষত্রিয় যদি স্বকর্মনিরত হয় তাহা হইলে সে দশাহেই শুচি হইবে। সুতরাং স্বকর্মনিরত নহে এইরূপ নির্গুণ ক্ষত্রিয়ের জন্য দ্বাদশাশৌচ ব্যবস্থা অশাস্ত্রীয় বা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ইহার পর সকল বর্ণের দশাহাশৌচের ব্যবস্থা। বীরমিত্রোদয়কার দেবলের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—'অত্যন্ত গুণবতাং সর্বেষামেব দশাহমাহ দেবলঃ। আশুচ্যং দশরাত্রং তু সর্বত্রাপ্যপরে বিদুঃ। নিধনে প্রসবেচৈব পশুস্তঃ কর্মণঃ ক্ষয়ম্'। স্মৃত্যন্তরে—'সর্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা। দশাহাৎ শুদ্ধিরেতেষাম্ ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ'। বীরমিত্রোদয়কার যাহাকে স্মৃত্যন্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন নির্ণয়সিন্ধুকার তাহাকেই অঙ্গীরার বচন বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

উদ্ধৃত বচনদ্বয় নানাকারণে বিশেষরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যোগ্য।

১. বচন দুইটি মন্বাদি সর্বজনস্বীকৃত ধর্মশাস্ত্রকারগণের মতের সহিত সামঞ্জস্যহীন ও উদ্ভট। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের জন্য শাস্ত্রকারগণ কল্পান্তরে সদ্যঃশৌচাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের অশৌচ ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? আমরা ইতিপূর্বে দেখিলাম জাতিমাত্রোপজীবী নির্গুণ অত্যন্ত নিকৃষ্ট নামধারক বিপ্র বা ব্রাহ্মণব্রুবের জন্য শাস্ত্রকারগণ দশাহাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের জন্য সদ্যঃশৌচাদিই বিহিত হইয়াছে।

২. দেবল বলিলেন ইহা 'অপরে বিদুঃ'—অন্যে জানে। এই অন্য কাহারা? দেবল নিজের মত বলিতেছেন না কেন? আর অঙ্গীরাই বা কেন 'ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ' এই বলিয়া শাতাতপের দোহাই দিতেছেন? নিজের মত বলিতেছেন না কেন?

৩. ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অন্য সকলের পক্ষেই এই ব্যবস্থা অশৌচ-সঙ্কোচের বিষয়। অশৌচসঙ্কোচ কলিযুগে স্বীকৃত নহে—'বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষম্ অঘসঙ্কোচনং তথা' আদিত্য পুরাণের এই বচনানুসারে অশৌচসঙ্কোচ কলিবর্জ্যপ্রকরণের অন্তর্গত বিষয়—'কল্পান্তরাণি কুর্বাণঃ কলৌভবতি কিল্বিষী'—অন্য কল্পে বিহিত আচার কলিযুগে অনুসরণ করিলে পাপী হইতে হইবে—ইহাই পরাশরের অভিপ্রায়।

৪. হারলতাকার যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিপ্রপরিচর্যাপর শূদ্রের জন্য দশরাত্রের অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও কলিবর্জ্যবিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হইয়া পড়ে। কারণ ইহাও 'বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষ অঘসঙ্কোচ'।

৫. বীরমিত্রোদয়কার বলিলেন—'অয়মশৌচসঙ্কোচঃ সগুণানামপি অশুচি পুত্রাদশম্ পর্কে এব সম্পর্কাৎ দুষ্যতে বিপ্রো জননে মরণেঽপি বা। সম্পর্ক বিনিবৃত্তানাম্ নাশৌচম্ নৈব সূতকম্ ইতি পরাশর উক্তেঃ'—এই অশৌচসঙ্কোচ সগুণগণেরও অশুচি পুত্রাদির সহিত সম্পর্ক না রাখিলেই বুঝিতে হইবে।

৬. মনুস্মৃতির প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই মহর্ষিগণ মনুর নিকট বলিলেন—'ভগবন্ সর্ববর্ণানাং যথাবদ্ অনুপূর্বসঃ অন্তরঃ প্রভবাণাং চ ধর্মান্ নো বক্তুম্ অর্হসি'—হে ভগবান! সকল বর্ণের পৃথক পৃথক যে সকল ধর্ম তাহা আমাদের বলুন।

এই বর্ণধর্মের উপরেই মন্বাদি সকল ধর্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। বর্ণধর্ম উপেক্ষা

করিলে ধর্মশাস্ত্রের কোন মর্যাদাই থাকে না। মন্বাদিশাস্ত্রে সর্বত্রই বর্ণগত পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। অঙ্গীরা ও দেবলের বচনে এই বর্ণগত পার্থক্যকেই উপেক্ষা করা হইয়াছে।

৭. 'ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ'—এই কথা শাতাতপ বলিয়াছেন বলিয়া সকল বর্ণেরই জননে ও মরণে দশহাশৌচের যে বচন বোম্বাই সংস্করণের কমলাকর ভট্ট প্রণীত নির্ণয়সিন্ধুধৃত অঙ্গীরার নামে এবং বোম্বাই সংস্করণের গরুড় পুরাণ প্রেতকল্প হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেগুলি মূল শাতাতপ সংহিতা, অঙ্গীর সংহিতা বা অন্য কোনস্থানে মুদ্রিত গরুড় পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পি তৃ য জ্ঞ

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সন্তান অত্রি। অত্রির সন্তান দত্তাত্রেয়। দত্তাত্রেয়ের সন্তান নিমি। নিমির পুত্র শ্রীমৎ। শ্রীমৎ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার পর কালগ্রাসে পতিত হন। দুঃখার্ত নিমি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া শ্রাদ্ধের কল্পনা করেন। তিনি নিজের মনোমত ফলমূলাদি ও শস্য ধ্যানবলে সংগ্রহ করেন। পরদিন অমাবস্যায় কতিপয় অর্চনীয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মানিত করিলেন। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে সাতজনকে লবণশূন্য শ্যামাক অন্ন প্রদান করিয়া ভোজনরত ঐ সকল ব্রাহ্মণের পাদদেশে দক্ষিণাগ্র কুশমুষ্টি বিস্তৃত করিলেন এবং মৃত পুত্রের নামগোত্র উল্লেখ করিয়া কুশোপরি পুত্রের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলেন। এই কার্য করিয়া তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—'হায়! ইহা আমি কি করিলাম! মুনিরা ইতিপূর্বে কখনও ইহার অনুষ্ঠান করেন নাই। অভিনব অবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণগণ যে আমাকে অভিসম্পাত দিবেন, তাহার হাত হইতে আমি কিরূপে রক্ষা পাইব!'

অতঃপর তিনি তাঁহার আদি বংশকর্তা অত্রিকে স্মরণ করিলেন। অত্রি চিন্তামাত্রই তপোবলে নিমির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমিকে

পুত্রশোকে অত্যন্ত বিহ্বল দেখিয়া নানারূপ সময়োচিত সদুপদেশ দিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। তিনি বলিলেন—"ওহে নিমি, তুমি যে অনুষ্ঠানের কল্পনা করিয়াছ তাহাই 'পিতৃযজ্ঞ'। মা ভৈষীঃ। ব্রহ্মা নিজেই পুরাকালে ইহা বিহিত করিয়াছেন" (মহাভারত অনুশাসনপর্ব ৯১ অধ্যায়)।

কেহ কেহ মহাভারতের এই অংশপাঠ করিয়া শ্রাদ্ধকে পরবর্তী কালের এবং নৈমিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি ১. পিতৃমেধ ২. পিতৃযজ্ঞ ৩. মহাপিতৃযজ্ঞ ৪. পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ ৫. পিতৃঅর্চনা প্রভৃতি বৈদিকযজ্ঞ পিতৃপূজারই নামান্তর। এই সকল অনুষ্ঠান মৃতের উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে। সুতরাং নিমি প্রবর্তিত 'শ্রাদ্ধ'কে কখনই শ্রাদ্ধের আদি বলা যাইতে পারে না।

নিমি যে তাঁহার প্রবর্তিত কর্মকে অভিনব বলিয়াছেন তাহার কারণ, মৃত পুত্রের উদ্দেশ্যে পিতার কর্মানুষ্ঠান, ইহাই নূতন। শাস্ত্রান্তরে ইহা নিষিদ্ধই হইয়াছে—'নচ মাতা নচ পিতা কুর্যাৎ পুত্রস্য পৈতৃকম্। নাগ্রজশ্চ তথা কুর্যাৎ ভ্রাতৃণাস্তু কনীয়সাম্। পিত্রা শ্রাদ্ধং ন কর্তব্যং পুত্রণাস্তু কথঞ্চন। ভ্রাত্রাচৈব ন কর্তব্যং ভ্রাতৃণাস্তু কনীয়সাম' (ক্রিয়ানিবন্ধোদ্ধৃত কাত্যায়ন বচন)। পরবর্তীকালে অবশ্য স্নেহবশতঃ অথবা উৎসন্ন বান্ধবস্থলে পিতামাতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃকও পুত্র বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পৈতৃক কার্যবিহিত হইয়াছে—'যদি স্নেহেন কুর্যাৎ তৎ সপিণ্ডীকরণং বিনা গয়ায়াস্তু বিশেষেণ জ্যায়ানপি সমাচরেৎ (কাত্যায়ন)। উৎসন্ন বান্ধবং প্রেতং পিতা ভ্রাতা তথাগ্রজঃ জননীচাপি সংস্কুর্যাৎ মহদেনোন্যথা ভবেৎ' (কমলাকরোদ্ধৃত সুমন্তবচন)। অথবা, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাদি যাহা বিহিত হইয়াছে তাহা ত্রিপুরুষাত্মক অর্থাৎ তাহাতে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই তিনপুরুষকে পিণ্ডদানাদি দ্বারা অর্চনা করা হয়। ইহাকে পার্বণশ্রাদ্ধ বলা হয়। নিমি যাহা করিলেন তাহা একপুরুষাত্মক। অর্থাৎ কেবল তাঁহার পুত্রের উদ্দেশ্যে। ইহাকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলা হয়। এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ অভিনব এবং নিমি কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে ইহা বলাই হয়ত ভারতকারের অভিপ্রায়। অথবা, প্রাচীন পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাদিতে অগ্নৌকরণ বা পিণ্ডদানই প্রধান। নিমি প্রবর্তিত শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনই প্রধান। এই জন্যই ইহাকে অভিনব বলা হইয়া থাকিবে।

কিন্তু অত্রির শেষ কথাটিও লক্ষণীয়—'শ্রুতিরেষা সনাতনী'। ব্রহ্মা এই পিতৃকার্য অতি প্রাচীন যুগেই প্রবর্তিত করিয়াছেন। সুতরাং নিমিকে পৈতৃক কার্যের

প্রবর্তক বলা যায় না। বেদ যেইরূপ নিত্য বা সনাতন বৈদিক পৈতৃক অনুষ্ঠানও সেইরূপ নিত্য ও সনাতন।

'শ্রাদ্ধ' শব্দটি কোনও বৈদিক সংহিতা বা ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম এই শব্দটি কঠোপনিষদে (অধ্যায় ১, বল্লী ৩, শ্লোক ১৭) দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত এই শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। এই সকল পণ্ডিতের মত স্বীকার করিয়া লইলে আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে (৪, ৭, ১) ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। অস্থি সঞ্চয়ন উপলক্ষ্যে এই শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রেতের পিতৃত্ব প্রাপ্তি।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে শ্রাদ্ধ শব্দটি এবং ইহার প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণ ভোজন বৌদ্ধগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পালি সাহিত্যে সংস্কৃত শ্রাদ্ধ কথার অনুরূপ শব্দ 'সদ্ধ'। এই 'সদ্ধ' কথাটির অর্থ মৃত আত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু দানরূপ প্রেতকৃত্য। সুতরাং শ্রাদ্ধ শব্দটি এবং তাহার প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণভোজন বৌদ্ধগণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়া থাকিবে। পণ্ডিতগণের এইমত গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদিগকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে (৫ ২, ৮৫) 'শ্রাদ্ধ' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। সূত্রটি হইল 'শ্রাদ্ধম্ অনেন ভুক্তম্ ইনি ঠনৌ'—ইহার অর্থ 'অনেন ভুক্তম্' এই-অর্থে শ্রাদ্ধ শব্দের উত্তরে ইনি এবং ঠন্ প্রত্যয় হয়। শ্রাদ্ধের অন্ন যে ভোজন করে তাহাকে শ্রাদ্ধী ও শ্রাদ্ধিক বলা হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পাণিনির সময়, ব্রাহ্মণভোজন প্রধান অঙ্গ যাহার, এইরূপ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রচলিত ছিল। অনেক পণ্ডিতের মতে পাণিনি বৌদ্ধপূর্ব যুগে জন্মগ্রহণ করেন। আরও, গৃহ্য সূত্রগুলিতেও বৌদ্ধপূর্ব যুগের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষত অষ্টকশ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে গোহনন এবং গোমাংসভক্ষণ গৃহ্যসূত্রে বিহিত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রে শ্রাদ্ধে নানাবিধ প্রাণীর মাংস প্রদানের প্রশংসা করা হইয়াছে। এই মাংস পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যেই অর্পণ করিতে হইবে। বৌদ্ধপ্রভাবে এই সকল অনুষ্ঠান বিহিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করা যায় না; বৌদ্ধগণ অহিংসা-কেই পরমধর্ম বলিয়া মনে করেন। সুতরাং গৃহ্যোক্ত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বৌদ্ধপূর্ব কোন প্রাচীন যুগেই প্রচলিত হইয়া থাকিবে। মহাকবি ভাসকে পাণিনিরও

পূর্ববর্তী কবি বলিয়া নির্দেশ করা হয়। মহাকবি ভাসের প্রতিমা নাটকে (৫ম অঙ্ক) আমরা শ্রাদ্ধ শব্দটি দেখিতে পাই, 'সর্বম্ শ্রদ্ধয়া দত্তম্ শ্রাদ্ধম্'। প্রচেতা রচিত 'শ্রাদ্ধ কল্প' নামক গ্রন্থের নামও এই নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যে শ্রাদ্ধ শব্দটি দেখিতে পাওয়া না গেলেও ইহা যে বৌদ্ধপূর্ব যুগেই প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভাবের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও পিতৃকৃত্য যে বৈদিক ভাবধারার সহিতই সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই বিষয়েও সন্দেহের কোন অবসর থাকেনা।

পিতৃযজ্ঞ এবং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ বৈদিক অনুষ্ঠান। ইহারা পিতৃদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুষ্ঠিত। বৈদিক চিন্তাধারায় অন্ত্যেষ্টির অব্যবহিত পরেই মৃত ব্যক্তি পিতৃত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রেত এবং আতিবাহিক শরীরের কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে প্রায় অপরিজ্ঞাত। সুতরাং মৃতব্যক্তি যথাযথ অন্ত্যেষ্টির পরই পিতৃ-দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত পিতৃযজ্ঞ বা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের দেবতারূপে প্রদত্ত পিণ্ডাদি গ্রহণে অধিকারী হন। কিন্তু পরবর্তীযুগে মৃতব্যক্তির পিতৃত্ব প্রাপ্তির জন্য সাধারণতঃ এক বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। অন্ত্যেষ্টির অব্যবহিত পরে সে 'আতিবাহিক শরীর' লাভ করে। পূরকপিণ্ড দান করিয়া তাহাকে এই আতিবাহিক শরীর হইতে উদ্ধার করিতে হয়। এই আতিবাহিক শরীর ধ্বংস হইলে মৃতব্যক্তি 'প্রেত শরীর' লাভ করে। প্রেত শরীর ধ্বংস করিবার জন্য মাসিক একোদ্দিষ্ট এবং সপিণ্ডীকরণের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠিত হইলে মৃতব্যক্তি পিতৃত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পিতৃত্ব লাভ করিলেই মৃতব্যক্তি পার্বণশ্রাদ্ধে অর্চিত হইবার অধিকার লাভ করে। এই পার্বণশ্রাদ্ধ হইল বৈদিক পিতৃযজ্ঞ, মহাপিতৃযজ্ঞ এবং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুরূপ।

'পিতৃ' শব্দটির অর্থ লইয়া কোন কোন পণ্ডিতমহলে মতান্তর রহিয়াছে। আর্য-সামাজিকগণ 'পিতৃ' অর্থে জীবিত পিতাই বুঝিয়াছেন। 'পঞ্চজনা' অর্থে আচার্য উপমন্যু পাঁচ শ্রেণীর সামাজিক মানুষকে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই পাঁচ শ্রেণীর মানুষ হইল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ। আর্যসামাজিক-গণ 'পঞ্চজনা' অর্থে পিতৃগণকে বুঝিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের যুক্তির ধারা এইরূপ—মনুষ্যগণ পঞ্চজন, পিতৃগণও পঞ্চজন। সুতরাং পিতৃগণ মনুষ্য।

আর্যসামাজিক পণ্ডিতগণের মতে পিতৃগণ হইলেন বানপ্রস্থাশ্রমী মনুষ্য।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক এই তিন লোকের

উল্লেখ আছে। এই সকল পণ্ডিতের মতে 'লোক' শব্দটির বৈদিক অর্থ আশ্রয় বা আশ্রম। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্যলোককে জয় করা হয়। ধর্মীয় কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা পিতৃলোককে জয় করা হয়। বিদ্যার দ্বারা দেবলোককে জয় করা হয়—মনুষ্যলোকঃ পুত্রেনৈব জয্যো নান্যেন কর্মণা, কর্মণা পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া দেবলোকঃ (বৃ. উ. 1. 5.)।

এই সকল পণ্ডিতের মতে মনুষ্যলোকের অর্থ গৃহস্থাশ্রম। 'পিতৃলোক' এই শব্দটির অর্থ বানপ্রস্থ এবং 'দেবলোক' শব্দটির অর্থ সন্ন্যাসাশ্রম। কারণ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই গৃহস্থাশ্রমের কার্য সম্পূর্ণ হয়। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বাণপ্রস্থাশ্রমের কার্য সম্পূর্ণ হয় এবং জ্ঞানের সাধনায় সন্ন্যাসাশ্রমের কার্য সম্পূর্ণ হয়।

প্রখ্যাত আর্যসামাজিক পণ্ডিত চন্দ্রমণি বিদ্যালঙ্কার বলেন যে, পিতৃগণ হইলেন বানপ্রস্থাশ্রমী দ্বিজাতিগণ। ইহাদের প্রামাণ্য অভিধান 'শব্দার্থ মুক্তাবলী'-র মতে 'পিতৃ' শব্দের অর্থ 'বয়স্থ বিদ্বান্'। সুতরাং তাহাদের মতে 'পিতৃ' শব্দের অর্থ হইল বানপ্রস্থাশ্রমী বৃদ্ধ দ্বিজাতি মনুষ্যবিশেষ।

মনু পিতৃগণকে 'অক্রোধন', 'শৌচপর', 'নিয়ত ব্রহ্মচারী', 'অস্ত্রহীন' এবং 'প্রতিভাদীপ্ত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতের মতে তাঁহারা 'পিতৃ' শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন সেই অর্থ গ্রহণ করিলেই মনূক্ত বিশেষণগুলি উপযুক্ত রূপে প্রযোজ্য হয়। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও তাঁহার ঋগ্বেদ ভাষ্যের ভূমিকায় এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

পিতৃযজ্ঞের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—যে কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিদ্বান, মনুষ্যগণ, দিব্যমনুষ্যগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃগণ তৃপ্ত হন তাহার নাম তর্পণ। শ্রদ্ধার সহিত ইহার অর্চনার নাম শ্রাদ্ধ। গ্রহীতা জীবিত থাকিলেই এই সকল কর্মানুষ্ঠান সম্ভব হয়। জীবিত না থাকিলে সম্ভবপর হয় না। কারণ সেব্য এবং সেবক মিলিত হইলেই সেবকের পক্ষে সেবা করা সম্ভব হয়। অন্যথা প্রাপ্তির অভাব ঘটিবার জন্য এই সকল কর্মানুষ্ঠানের কোন অর্থই থাকে না—'তত্র বিদ্বৎসু বিদ্যামানেষু এতৎ কর্ম সংঘট্যতে, নৈব মৃতকেষু, কুতঃ ? তেষাম্ প্রাপ্ত্যভাবেন সেবনা শক্যত্বাৎ, তদর্থকৃতঃ কর্মণঃ প্রাপ্ত্যভাবঃ ইতি ব্যর্থতা পত্তেশ্চ। তস্মাৎ বিদ্যামানাভিপ্রায়ে নৈতৎ কর্ম উপদিশ্যতে, সেব্যসেবক সন্নিকর্ষাৎ সর্বমেতৎ কর্তুং শক্যতে ইতি।'

সুতরাং এই সকল পণ্ডিতের মতে 'পিতৃ' শব্দের দ্বারা জীবিত বানপ্রস্থাশ্রমী দ্বিজাতি মনুষ্যকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা পিতৃকৃত্য সম্ভব বা সার্থক হইতে পারে না। ইহারা বেদোক্ত পিতৃকার্যের সকল মন্ত্রেরই অর্থ এই ভাব ধারার অনুকূলে করিয়াছেন—'ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা'। এই সকল পণ্ডিতের মতে 'পিতৃ' শব্দের লোকপ্রচলিত অর্থ প্রকৃত নহে। এই শব্দে মৃত পিতাকে বুঝায় না, জীবিত পিতাকে বুঝায়।

তাঁহাদের যুক্তি অবিচারিতরমণীয় সন্দেহ নাই। 'পিতৃ' শব্দটি যে মনুষ্যবাচী তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহারা যে তর্ককে অবলম্বন করিয়াছেন তাহা হেত্বাভাস মাত্র, সুষ্ঠু তর্ক নহে। দুষ্ট তর্কমাত্র। পৃথিবী গোলাকার। চন্দ্রও গোলাকার। সুতরাং পৃথিবীই চন্দ্র—এইরূপ তর্কে যে দোষ আছে, এই পণ্ডিতগণের তর্কেও সেই দোষ বর্তমান।

যাস্কের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, 'পঞ্চজনা' শব্দটি কেবল মনুষ্যবাচী নহে। যাস্কের অভিপ্রায় এই—'পঞ্চজনা' শব্দটির দুটি অর্থ। আচার্য উপমন্যু একটি অর্থের নির্দেশ দিয়াছেন। অন্য অর্থের নির্দেশ দিয়াছেন অন্য পণ্ডিতগণ। উপমন্যুর মতে এই শব্দটির অর্থ চারিটি বর্ণ এবং নিষাদ। সম্ভবত এই নির্দেশের দ্বারা তিনি সমগ্র জাতিকেই বুঝাইয়াছেন। নিঘণ্টু কোষের অর্থের সহিত ইহার পার্থক্য নাই। কিন্তু যাস্ক 'পঞ্চজনা' শব্দের আর একটি অর্থও জানেন। 'পঞ্চজনা' শব্দটি কেবল মনুষ্যজাতিকে বুঝায় না। ইহা মনুষ্যজাতিবহির্ভূত গন্ধর্ব, পিতৃ, দেব, অসুর এবং রাক্ষসগণকেও বুঝায়।

নিরুক্তভাষ্যকার দুর্গাচার্যের মতে 'পঞ্চজনা' শব্দটির অর্থ সন্দিগ্ধ অর্থাৎ ইহা একার্থক নহে, উভয়ার্থক—'তত্র পঞ্চজনাঃ ইত্যস্য নিগমাঃ ভবন্তি সন্দিগ্ধা'। দুর্গাচার্য ঋগ্বেদ (VIII 6. 3. 7) হইতে ঋকৃটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্তস্থলে 'পঞ্চজনা' শব্দটি নিঃসন্দেহে মনুষ্যবাচী। কিন্তু ঋগ্বেদের (X. 53. 4) ঋকৃটিতে 'পঞ্চজনা' শব্দটির অর্থ সন্দিগ্ধ—ইহা মনুষ্যবাচীও হইতে পারে আবার ইহা গন্ধর্ব, পিতৃ, দেব, অসুর এবং রাক্ষসকেও বুঝাইতে পারে। দুর্গাচার্যের আলোচনা হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে 'পঞ্চজনা' শব্দটি যখন মনুষ্যবাচী হয় তখন ইহা চতুর্বর্ণ এবং নিষাদকে বুঝায়। কিন্তু ইহা সকল সময়েই কেবলমাত্র মনুষ্যবাচী হয় না। ইহা কখনও কখনও গান্ধর্ব, পিতৃ প্রভৃতি অমনুষ্যবাচীও হয়।

দেবতা, অসুর, পিতৃ, গন্ধর্ব, রাক্ষস এবং মনুষ্যজাতি যে পরস্পর হইতে পৃথক্ তাহা বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিশেষ করিয়া যাস্কের নিরুক্তে (VII. 4) ইহাদের বর্ণনা হইতে অসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারা যায়।

কোন কোন আর্যসামাজিক মনে করেন যে, বৈদিক যুগে পিতৃযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে জীবিত পিতৃপুরুষগণই অর্চিত হইতেন। সুতরাং 'পিতৃ' শব্দের অর্থ জীবিত পিতাই। তাঁহারা হয়তো আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রোক্ত গাণগবী এবং আশ্বলায়নের মত হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞে জীবিত পিতার অর্চনা এবং তাহার উদ্দেশ্যে হোমবিধান করিয়াছেন। এইমত গ্রহণীয় নয়। কারণ ইহা শিষ্টগণকর্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই। শিষ্টগণ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে 'পিতৃ' শব্দের দ্বারা মৃত পিতৃপুরুষগণকেই বুঝাইয়াছেন।

পিতৃযজ্ঞের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগত 'আমি' কে বৃহত্তর 'আমি'তে পরিণত করা, ক্ষুদ্র 'আমি'-কে বিরাট 'আমি'তে পরিণত করা। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষের উদ্দেশ্যে তিনটি পিণ্ডদান করিতে হয়। পিতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম পিণ্ডটি সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর প্রতীক, ইহাকে পৃথিবীরূপে ধ্যান করিতে হইবে এবং পিতাকে অগ্নিরূপে, ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে, চিন্তা করিতে হইবে। দ্বিতীয় পিণ্ডটি অন্তরীক্ষ বা আকাশের প্রতীক। পিতামহকে ইহার অধিষ্ঠাতা বায়ুরূপে কল্পনা করিতে হইবে। তৃতীয় পিণ্ডটি দ্যুলোকের প্রতীক। প্রপিতামহকে ইহার অধিষ্ঠাতা সূর্যরূপে কল্পনা করিতে হইবে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতার পিতা হইলেন পৃথিবী ও তদধিষ্ঠাতা অগ্নি, পিতামহ হইলেন অন্তরীক্ষলোক ও তদধিষ্ঠাতা বায়ুমণ্ডল এবং প্রপিতামহ হইলেন দ্যুলোক এবং তাহার অধিষ্ঠাতা সৌরমণ্ডল। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের সহিত, অগ্নি, বায়ু ও রবি মণ্ডলের সহিত, শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতার 'জন্য-জনক' সম্বন্ধ। বিরাট বিশ্বের সহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতা পরম আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ। তাই এই তিন পিণ্ডদানরূপ অনুষ্ঠান।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে দেখিতে পাই দেবী বাক্ বলিতেছেন – 'আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি, আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি। মিত্র ও বরণ উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। ইন্দ্রকে অশ্বিদ্বয়কেও আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। আমি ব্রহ্মদ্বেষীর নাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করি। আমি জনহিতার্থে সংগ্রাম করি। আমি দ্যাবা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি।

ঊর্ধ্বভাগে দ্যৌকে প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে, বিশ্বভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি, দ্যুলোককে আমি স্বদেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি। বিশ্বভুবননির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্বত্র প্রবাহিত হই। পৃথিবীর পরে, দ্যুলোকের পরে, যাহা কিছু বিদ্যমান, সর্বত্র, আমি আমার মহিমার দ্বারা সম্ভূত হই।' এইস্থলে দেবী বাক্ আপনাকে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত একীভূত করিয়াছেন। এই মন্ত্রের উপাসকও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-রূপিণী দেবী বাকের সহিত উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র আমিকে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় আমিতে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হন।

উক্ত ঋগ্বেদে পুরুষসূক্তেও 'পুরুষের' বিশ্বময় বিরাট দেহের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—'পুরুষের সহস্র শীর্ষ, সহস্র চক্ষু, সহস্র পাদ। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া তাহারও উর্ধে দশ আঙ্গুলি পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছেন।' এই মন্ত্রের উপাসকও দেবীসূক্তের উপাসকের ন্যায় আপনার ক্ষুদ্র আমিকে বিশ্বময় বিরাট আমিতে পরিণত করিতে চাহেন। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে যে বিশ্বরূপা মাতৃমূর্তির কল্পনা করা হইয়াছে তাহারও উপাসনার উদ্দেশ্য দেবী-সূক্তের উপাসনা হইতে অভিন্ন।

আমরা দেখিলাম বৈদিক ভাবধারায় যে উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য পরিদৃশ্যমান বিরাট বাহ্য জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র আপন ব্যক্তিগত সত্তাকে বৃহত্তম সত্তায় পরিণত করা। বৈদিক পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া স্মার্ত ও পৌরাণিক তর্পণাগুলি পর্যন্ত সকল পৈত্রিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেও কি তাহাই নহে? পিতৃকৃত্যের উদ্দেশ্যও তো মৈত্রীভাবনার দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত পরম আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার ক্ষুদ্র সত্তাকে বৃহত্তর সত্তায় পরিণত করা?

মনু বলিয়াছেন—'পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্'—তর্পণই পিতৃযজ্ঞ, অর্থাৎ যেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে তর্পণের অনুষ্ঠানের দ্বারাও সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। তর্পণানুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতা পিতৃগণের সহিত, দেবগণের সহিত, প্রাণীজগতের সহিত, মনুষ্যজগতের সহিত, বৃক্ষলতাগুল্মাদি হইতে আরম্ভ

করিয়া ব্রহ্ম পর্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের সহিত, পুণ্যাত্মা ও পাপীর সহিত, নিখিল বিশ্বের সহিত পরম আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতাম্' বলিয়া জলগণ্ডুষ দান করেন। ক্ষুদ্র 'আমি'কে বিরাট 'আমি'তে পরিণত করা, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্থাপন করাই পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

এই পিতৃযজ্ঞ আবার গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত একটি যজ্ঞ— 'যৎ পিতৃভ্যঃস্বধা করোতি অপি অপঃ। তৎ পিতৃযজ্ঞ সন্তিষ্ঠতে' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। মনুষ্য জন্মমাত্রেই কয়েকটি ঋণে আবদ্ধ হয়। দেবগণ মানুষের ভাগ্য বিধাতা; পিতৃগণ তাঁহাকে মানবজন্ম দিয়াছেন; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যাই তাহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করিয়াছে; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতেছে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত কোন না কোনও রূপে তাহার জীবন রক্ষায় সাহায্য করিতেছে; অতএব ইহাদের সকলের নিকটেই মানুষের ঋণ আছে। এই পাঁচটি ঋণ লইয়াই মানুষকে জন্মিতে হয়। এক একটা ঋণ শোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ব্যাপক অর্থে এই ত্যাগের নাম যাগ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন,—"যদগ্নৌজুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"— দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিৎ ফেলিয়া দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোতি অপি অপঃ, তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"— পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্ততঃ এক গণ্ডুষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরদি, তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ভূতগণের অর্থাৎ পশুপক্ষীগণের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো অন্নং দদাতি, তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ীত একামপি ঋচং, যজুং সাম বা তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—বেদাধ্যয়ন করিলে, অন্তত একটি ঋক্, একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা নাই; দ্রব্যের বাহুল্য নাই।

গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞকয়টি কর্তব্যকর্ম। জগতে তিনি যে একাকী আসেন নাই

এবং একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাঁহাকে স্থির প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে ঋণ স্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন না কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটি সর্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শুধিতে পারে না, তবে এই ঋণগুলি স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। এস্থলে সমস্ত জগৎই দেবতা। জগতে যাহা কিছু আছে সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারার্থ প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই পাঁচটি যজ্ঞকে 'মহাযজ্ঞ' বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন,—"পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়স্তে, সততি সন্তিষ্ঠন্তে"—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ সতত অর্থাৎ দিনেদিনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনেদিনে সমাপ্ত করিতে হইবে।

যেই উদ্দেশ্যে শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকাদিতে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ এবং বেদোক্ত পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাদি এবং তাহার বিকৃতি অন্বাহার্য পার্বণাদি অনুষ্ঠানেরও সেই উদ্দেশ্য। সুতরাং ভাববিচারে শ্রাদ্ধকে বৈদিক ভাবধারার বাহকই বলিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে লোকায়তিকগণ—পরলোক, জন্মান্তর, দেহাতিরিক্ত অবিনশ্বর আত্মা, কর্মফল এবং বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না। সকল দেশেই মৃতের অর্চনা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকারের উপর নির্ভরশীল। আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকৃত না হইলে মৃত পিতৃপুরুষাদির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। মৃত্যুর পর মৃত পিতৃপুরুষাদির কোনও অস্তিত্ব না থাকিলে কাহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি অর্চনা করা হইবে? লোকায়তিকগণের নিকট বেদাদিশাস্ত্র বা আপ্তবাক্যও প্রমাণ নহে। সুতরাং তাহারা মৃতের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদিতে যে কোনও ফলের উদয় হয় তাহা স্বীকার করেন না। তাহারা বলিয়া থাকেন—'মৃতানাম্ অপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তি কারণম্। নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্ধয়েৎ শিখাম্॥ গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্। গেহস্থ কৃত শ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তি রবারিতা॥ স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্রদানতঃ। প্রাসাদস্যোপরি স্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বাং ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য

— ৬

দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥ ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিত স্থিহ। মৃতানাং প্রেত কার্যাণি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।'—স্বর্গ, অপবর্গ, বা পরলোকগামী আত্মা বলিয়া কিছু নাই। যে জন্তু মরিয়াছে, শ্রাদ্ধে যদি তাহারও তৃপ্তি জন্মে তবে পর্যটকদিগের পাথেয় সঙ্গে রাখিবার প্রয়োজন নাই। নির্বাণপ্রাপ্ত প্রদীপেরও শিখা তৈলদ্বারা সংবর্ধিত হইতে পারে। যদি স্বর্গস্থিত লোক ভূতলস্থ দানে তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে প্রাসোদোপরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূতলে অন্ন কেন দাও না? যতদিন জীবিত থাক, সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর, ঋণ করিয়াও ঘৃত খাও, ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথায়? যদি দেহ হইতে নির্গত হইয়া কেহ পরলোকে যায়, তবে বন্ধু স্নেহে আকুল হইয়া কেন ফিরিয়া আসে না? সুতরাং মৃতদিগের প্রেতকার্য বিহিত করা ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় মাত্র।

ভারতীয় দর্শনকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই যুক্তিবলে এই মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা না জানিয়াও আমরা বলিতে পারি শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্যের মূল বিশ্বাস বা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা—'শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধা যতো মূলম।'

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন পুত্র-কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি কর্মের ফলে কিরূপে মৃত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার বা তৃপ্তি বা অন্যবিধ উপকার সম্ভব? একজনের কর্মের ফল কিরূপে অন্যে ভোগ করিবে? একের পাপ-পুণ্য কি অপরে সংক্রামিত হইতে পারে?

বেদান্ত সূত্রকার বাদরায়ণ এবং শঙ্করাচার্য শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে একের পাপ-পুণ্য অপরে সংক্রামিত হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে। যখন-কোন জ্ঞানীব্যক্তি দেহত্যাগ করেন তখন তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার পুণ্য এবং শত্রুগণ পাপ প্রাপ্ত হয়।

মনুস্মৃতির প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্টের মতেও একের পাপ-পুণ্য অপরে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। তিনি ইহার সমর্থনের জন্য মনুস্মৃতির অংশ উদ্ধার করিয়া (VI. 79 and VII. 94, 95) বলিয়াছেন—কোন্‌টি পাপ আর কোন্‌টি পুণ্য তাহা শাস্ত্রেই বলিয়া দেয়। এবং একের পাপ এবং পুণ্য অপরে সংক্রামিত হইতে পারে, ইহাও শাস্ত্ররই নির্দেশ। শাস্ত্রমাত্রই প্রামাণিক। পাপ-পুণ্য

বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য করিবার কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না—'অন্যদীয় পুণ্যপাপে অন্যত্র সংক্রমেতে ইতি শাস্ত্রপ্রামাণ্যা বেদান্ত সূত্রকৃতা বাদরায়ণেন নির্ণীতোহয়মর্থঃ।' 'শাস্ত্রপ্রমাণকৈচ সকৃত দুষ্কৃতে যথা শাস্ত্রং সংক্রময়ন্তে এব সিদ্ধতঃ। অতএব উপজীব্য শাস্ত্রেণ বাধনাৎ ন প্রতিপক্ষানুমানোদয়োপি'। মনুস্মৃতির প্রাচীন টীকাকার মেধাতিথি কিন্তু এই মত সমর্থন করিলেন না। তাঁহার মতে অন্যকৃত শুভাশুভ অন্যে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব নহে—'নহি অন্যেনকৃত শুভাশুভং বা অন্যস্য সম্ভবতি।'

জৈমিনির পূর্বমীমাংসায় (Chapter IV, Pada III, Sutra 38) সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে পিতৃকৃত কর্মের ফল পুত্রে সংক্রামিত হইতে পারে।

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতা 'বৈশ্বানরেষ্টি' যাগের অনুষ্ঠান করেন। প্রশ্ন হইল এই যজ্ঞের দ্বারা কে পূত হয়? সিদ্ধান্ত হইল, যে জন্মগ্রহণ করার জন্য এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে—সেই পুত্রই এই যাগের দ্বারা পূত হয়। পিতাই পুত্রের পবিত্রতা কামনা করেন। তাই তিনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পিতৃকৃত কর্মের ফল যেমন পুত্র ভোগ করে, সেইরূপ পুত্রকৃত শ্রাদ্ধাদিকর্মের ফলও পিতা ভোগ করিবে ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই।

জৈমিনির মতে যজমান কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিত কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্মের ফল যজমানই ভোগ করিয়া থাকে (জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর III. 8. 29. 208)। এইস্থলে পুরোহিতকে দক্ষিণার দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে বলা হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পুত্র-পৌত্রাদিও পিতা-পিতামহ কর্তৃক তাহাদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপ দক্ষিণার দ্বারা ক্রীত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কর্মের ফল পিতা-পিতামহাদি ভোগ করিবে, ইহা অসম্ভব নহে—'পিণ্ডং দত্বা ধনং হরেৎ'—ইহাই হইল শাস্ত্রের অনুশাসন।

সংস্কার এবং বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যজীবনের নিয়ামক। তর্ক বা বিচার বা প্রজ্ঞা ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া মানুষকে শাসনে আনিতে চায় বটে, সংযত করিতে চায় বটে, কিন্তু সর্বতোভাবে কৃতকার্য হয় না। কর্মপথে বাহির হইয়া মানুষ সহজে প্রজ্ঞার শাসন মানিতে চায় না। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। বিজ্ঞান বা দর্শনের সহিত ধর্মের যে একটা বিরোধ আছে তাহার মূল এখানেই। বিজ্ঞান বা দর্শন যাহাই বলুক, মানুষ তাহার সংস্কারকে এবং বিশ্বাসকে আপনার ধাতুর সহিত, আপনার প্রকৃতির সহিত, সামঞ্জস্য করিয়া বাঁধিয়া লয় এবং

অনুসারে কর্ম করিয়া থাকে। তাই চার্বাকের উক্তি মানুষকে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হইতে কোনও যুক্তির দ্বারাই বিরত করিতে পারে না।

প্রথমে মানুষ বিশ্বাস করিতে শিখিল যে—যে মানুষ জন্মিয়াছে তাহার সত্তা বা অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে না। কোথাও না কোথাও সে থাকিবেই। আমরা তাহাকে দেখিতে না পাইতে পারি। এই দেখিতে না পাওয়াদ্বারা তাহার অস্তিত্বের বিলুপ্তি স্বীকৃত হইতে পারে না। যে হইয়াছে সে থাকিবেই। অদৃশ্যভাবে বা দূরবর্তী স্থানে হইলেও জাত মাত্রেরই অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। এই বিশ্বাসের পর মানুষের মনে স্বভাবতঃই আর একটি বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করে। সেই বিশ্বাস হইল মৃতলোকে বিশ্বাস। মৃতলোকে বিশ্বাস হইতেই পিতৃগণে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ মৃত্যুভয়, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মৃতের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস এই তিনটি ধারণা হইতেই পিতৃগণের ধারণা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। পরবর্তীকালে অবশ্য এই পিতৃ শব্দটি কেবল মৃত পিতৃপুরুষগণকেই নহে—অদৃশ্য, দয়ালু, শক্তিমান অবিনশ্বর, দিব্যসত্তাবিশেষকে বুঝাইবার জন্যও প্রযুক্ত হইয়াছে।

মানবচরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিতে হয়। কেবল যুক্তি তর্ক প্রভৃতি মনুষ্যের মস্তিষ্কসুলভ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনার দ্বারা মনুষ্য চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হয় না। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃকার্যে, বিশ্বাস ভক্তি ও শ্রদ্ধাই মূল। শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম শ্রদ্ধা। ইহাও উপেক্ষণীয় নহে। ইহার অনুশীলনও অপেক্ষিত।

অ ন্ত্যে ষ্টি

অতীব প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে মৃতদেহের সংকারের জন্য সমাধি ও দাহ— এই দ্বিবিধ প্রথাই প্রচলিত ছিল। উভয় প্রথার মধ্য সমাধিই পূর্ববর্তী এবং দাহ পরবর্তী, ইহাই অনুমিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দাহপ্রথার প্রচলন পরবর্তীকালের। পারস্যের রাজাদের মধ্য প্রাচীনকালে কেবল সমাধিপ্রথারই প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীসেও সংকারব্যবস্থা রূপে সমাধিপ্রথাই প্রাচীনতম। সাইথিয়ান নৃপতিগণেরাও ছিলেন প্রাচীনকালে সমাধিপ্রথারই পরিপোষক। রোমান, কেল্ট এবং টিউটনগণের মধ্যও সমাধিপ্রথাই ছিল প্রাচীনতম প্রথা। কেবল ভারতবর্ষেই অতি প্রাচীনকাল হইতে সমাধি ও দাহ এই দুই প্রথার পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

সমাধি ও দাহ এই দুই প্রথার সহিত আর এক ধরনের সংকারপ্রথারও প্রচলন ছিল। এই প্রথানুসারে শবদাহের পর দগ্ধদেহের অংশবিশেষ, অস্থি বা ভস্ম সমাধিস্থ করা হইত।

আদিমযুগে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে নানাবিধ সংকারব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কোথাও শবদেহ পক্ষী বা জীবজন্তু দ্বারা ভক্ষণ করানো হইত, কোথাও নীলাকাশের নীচে শবদেহ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইত। কোথাও ছিল গুহা-

সমাধি, আর কোথাও বা ছিল সলিল-সমাধির ব্যবস্থা। তবে এই সকল ব্যবস্থার তুলনায় সমাধি ও দাহই অধিকতর প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

যে প্রথানুসারেই হউক না কেন, ভারতবর্ষে প্রাক্‌বৈদিক যুগ হইতেই মৃতদেহের সংকার ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতার যুগে, বৈদিক যুগে, গৃহ্য ও পৌরাণিক যুগে মৃতদেহের সংকার ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কালের পরিবর্তনে সংকার ব্যবস্থায়ও কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। হয়তো বিশ্বাসেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকিবে, কিন্তু দেহের বিনাশ হইলে তাহার যে সংকার আবশ্যক, এই মূল বিশ্বাসে কখনওই ফাটল ধরে নাই। মৃত্যুচিন্তা, মৃত্যু-পরবর্তীকালে আত্মার অবস্থান, মৃতদেহের সদ্‌গতি—এইসকল প্রশ্ন লইয়াই তাঁহারা নিয়ত আকুল ছিলেন।

মহেঞ্জদারো ও হরপ্পা-খননের ফলে আমরা অবগত হইলাম যে সিন্ধুসভ্যতার যুগে মৃতের উদ্দেশ্যে নানাবিধ উপহারদ্রব্য উৎসর্গ করা হইত। সেই উপহার দ্রব্যের সহিত থাকিত শবাধার, দগ্ধ অস্থি ও ভস্ম রাখিবার পাত্র। কিন্তু ইহাদের মধ্য অন্য সব কিছু পাওয়া গেলেও অস্থির সন্ধান মিলিত না। দগ্ধ অস্থিগুলি তবে কি হইত? সম্ভবতঃ চূর্ণ করা হইত। কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে উহার সদ্‌গতি হইত। বেলুচিস্থানের নানাপ্রান্ত হইতে স্যার অরেল ষ্টেন উপরিউক্ত আকৃতির কিছু শবাধারের সন্ধান পান। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে মৃতদেহ দাহ করিয়া অতঃপর তাহার কিছু অংশের সমাধি প্রদানের কোনও প্রথা হয়তো তখন প্রচলিত ছিল।

বৈদিক যুগেও এই প্রথার নিদর্শন পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অধিকাংশ সূক্তই সংকারানুষ্ঠানবিষয়ক। যজুর্বেদ সংহিতায়ও সংস্কারসংক্রান্ত কিছু কিছু সূক্ত পাওয়া যায়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের মতে ব্যবহারবিধিবিষয়ক এই সকল মূলগ্রন্থে দাহ এবং দাহ-পরবর্তী সমাধি ব্যবস্থা—মৃতদেহের এই দ্বিবিধ সংকার প্রথাই বর্ণিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ এবং অথর্ববেদের সূক্তাবলী পারম্পর্যযুক্ত নহে। সূক্তের অর্থ হইতে অথবা মূলগ্রন্থ হইতে আমরা বিধি-বিধানগুলি অনুমান করিয়া লইতে পারি মাত্র। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সূক্তগুলি কিন্তু পারম্পর্যযুক্ত।

ঋগ্বেদের অন্ত্যেষ্টিসূক্তের অর্থ অনুসরণ করিলে আমরা কতগুলি তথ্য জানিতে

পারি। ঐকালে সমাধি ও দাহ—এই দ্বিবিধ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। একটি ছাগ এবং একটি গাভীকে মৃতদেহের সহিত দগ্ধ করা হইত। শবদেহটি গাভী অথবা ছাগের চর্ম, চর্বি এবং মজ্জাদ্বারা এরূপভাবে আচ্ছাদিত কবা হইত যাহাতে অগ্নি দেহটিকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করিতে না পারে। প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তাপ যেন দেহটিকে তেমন যন্ত্রণা না দিতে পাবে। সোমযাগের যিনি যজমান তাঁহাব যজ্ঞের দ্রব্যাদি তাহাব মৃতদেহেব সঙ্গে দগ্ধ কবা হইত। মৃতদেহটিকে যমরাজের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাওয়াব জন্য অগ্নিকে আহ্বান জানানো হইত। পিতৃযজ্ঞেব অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। মৃতদেহের নিরাপত্তার জন্য এবং পিতৃলোকে মৃতেব উত্তবণের জন্য পূষণ, বায়ু, অগ্নি এবং সবিতৃদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো হইত। জীবিতগণেব নিরাপত্তার জন্য একটি প্রস্তরখণ্ড দিয়া গণ্ডী অঙ্কন করা হইত।

এই সকল তথ্য হইতে অনুমান কবা যায় যে এই কালে সমাধি ও দাহ ও দাহ-পরবর্তী সমাধির প্রচলন ছিল। সমাধিব্যবস্থার মধ্য যতদিন সম্ভব মৃতের দেহটিকে রক্ষা করিবাব ইচ্ছা প্রকাশ পাইত। অথবা মৃতদেহটিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখিবাব উদ্দেশ্য ছিল দেহের সহিত মৃতের আত্মাও যেন ঐ নির্দিষ্ট স্থানটিতে আবদ্ধ থাকে। নতুবা ঐ অশুভ আত্মা অপরাপর জীবিত স্বজনদেব ক্ষতিসাধন কবিতে পাবে। পক্ষান্তরে, সমাধির বিপরীত ব্যবস্থা দাহপ্রথায় মৃতদেহকে নিঃশেষে ভস্মীভূত কবিবার মধ্য যে একটি আমূল পরিবর্তিত মানসিকতাব পবিচয় পাওয়া গিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমে মৃত্যু সম্বন্ধে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাসেও পরিবর্তন হইল। দাহপ্রথার অনুকূলে মানুষ নানাবিধ যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইল।

কোন কোন পণ্ডিত মনে কবেন দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিবার সর্বাপেক্ষা ত্বরিত এবং সহজতম উপায় হইল দাহব্যবস্থা। ইহাদের মতে যতদিন দেহ রক্ষিত থাকে, আত্মাও ততদিন আবদ্ধ থাকে। ইহাতে আত্মার মুক্তি যেমন ব্যাহত হয় তেমনি ঐ আত্মাব পক্ষে অন্যান্য জীবিতগণের ক্ষতি সাধনও সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং কি মৃত কি জীবিত উভয়ের স্বার্থেই দাহব্যবস্থা প্রশস্ততম।

কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন আত্মা পরলোকে গিয়া যাহাতে শান্তি লাভ করে

তাহার জন্যই এই ব্যবস্থার প্রয়োজন, কেহ কেহ আবার জীবিত স্বজনদের শান্তি রক্ষার উপরই অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন।

কেহ কেহ অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সময় একই ধরনের চিন্তাধারার উদ্ভবে আর্যজাতির মধ্য শবদাহ প্রথার প্রসার ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মতে, বিশেষ প্রথায় বিশ্বাসী উত্তর ইউরোপের এক উপজাতির বিজয় অভিযানের ফলে গ্রীস, রোম, পারস্য ও ভারতবর্ষে শবদাহপ্রথার প্রসার ঘটিয়াছিল। এই উপজাতি বিশ্বাস করিত মৃত্যুর দ্বারা জীবনে যে কলুষের, যে অপবিত্রতার সৃষ্টি হয় একমাত্র অগ্নিদ্বারাই সেই কলুষ বনাশ সম্ভব এবং স্বর্গগমনের ইহাই একমাত্র উপায়।

কোনও কোনও চিন্তাবিদ্ মনে করেন, যে সকল জাতির নির্দিষ্ট কোন বাসভূমি নাই তাহাদের পক্ষে দাহ-ব্যবস্থাই প্রশস্ততম। কারণ, ইহাদের পক্ষে মৃতদেহ সুরক্ষিত রাখা অসুবিধাকর এবং অরক্ষিত মৃতদেহের সাহায্যে 'তুকতাক' জাতীয় অমঙ্গলসাধন সম্ভব। দাহ-প্রথা প্রবর্তনের ফলে এই আশঙ্কা দূরীভূত হইল।

যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মৃতব্যক্তি জীবিতগণের ক্ষতিসাধন করিতে পারেন—তাঁহাদের পক্ষেও দাহপ্রথা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল। দাহ প্রথা প্রচলনের পিছনে আরও কয়েকটি কারণ রহিয়াছে। আদিম আর্যগণ পরিবার এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করিতেন। ঐ পরিবার ও গোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষদের মৃত্যুর পর বাসস্থানের সন্নিহিত কোন স্থানে সমাধিস্থ করা হইত। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মৃতের আত্মা ঐ সমাধিস্থলেই রহিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠীগুলি এক একটি রাজ্যে পরিণত হইল। রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই সময় পরিবর্তিত বিশ্বাস লইয়া মানুষ ভাবিতে চাহিল মৃতের আত্মা একটি নির্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া কোনও দূরবর্তী লোকে গমন করে এবং সেই লোকটি কোনও বিশেষ শক্তিমানের দ্বারা শাসিত হয়। স্বর্গগমনের এই বিশ্বাস পোষণের পক্ষে সমাধি আদৌ অনুকূল প্রথা নহে, সুতরাং দাহপ্রথার প্রচলন হইল।

অধ্যাপক কীথের ধারণা, আত্মার স্বর্গগমনের জন্য মৃতদেহের দাহ প্রয়োজন—এ বিশ্বাস ঠিক বৈদিক যুগের নয়। ঋগ্বেদে এ নিদর্শন পাওয়া যায় যে সমাধি বা দাহ যে কোনও উপায়েই হউক সংকার হইলেই মৃতদেহ স্বর্গ লাভ করিয়াছে।

তাঁহার মতে অতি স্বাভাবিক নিয়মেই দাহপ্রথার প্রচলন ও প্রসার ঘটিয়াছে। দাহপ্রথার প্রবর্তনে মৃত্যুর অশুভ প্রভাব দূর করা সম্ভব হইয়াছে। যে অগ্নিকে মানুষ এবং দেবতাগণের সংযোগকারী বলিয়া মনে করা হইত সেই অগ্নির পূজারূপেই এই প্রথার সূত্রপাত। কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রথার সর্বপ্রথম সূচনা হইয়াছিল সম্ভবতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে। কারণ যুদ্ধকালে শত্রুর হাতে মৃতদেহের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি এবং অসম্মান হইবার সম্ভাবনা ছিল। অধ্যাপক কীথ্ মোটামুটি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে সংকারে দাহপ্রথার প্রচলন সম্পর্কে কেহ কেহ এই মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে যেখানে জ্বালানি কাঠের অভাব সেখানে মৃতদেহ জলে ফেলিয়া দেওয়া, পশুপক্ষীকে খাওয়ানো ইত্যাদি উপায়ে বিনষ্ট করা হইত, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্র জ্বালানি কাঠের প্রাচুর্য থাকায় দাহপ্রথাই প্রচলিত সংকারের ব্যবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশ্য জ্বালানি কাঠের প্রাচুর্যহেতু ভারতবর্ষে দাহপ্রথার প্রচলন হইয়াছিল এই যুক্তি আমরা মানিতে পারি না। আমরা বৈদিকসাহিত্যে এমন কতগুলি তথ্য লাভ করি যাহাতে স্বভাবতই মনে হয় এই দাহপ্রথার প্রসারের মধ্য বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাব গভীরভাবে কার্যকর।

ঋগ্বেদ এবং অথর্ববেদে 'পিতৃমেধ' যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অথর্ববেদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন মৃতের দাহ অনুষ্ঠানই 'পিতৃমেধ'। যদিও যজুর্বেদে কেবল অস্থিদাহ করাকেই 'পিতৃমেধ' বলা হইয়াছে তথাপি বৈদিকযুগে 'পিতৃমেধ' শব্দটি মৃতদেহের দাহ এবং অস্থিসমাধি এই উভয়বিধ অর্থেই প্রযুক্ত হইত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও এই অর্থেই 'পিতৃমেধ' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে শব্দটি 'পুরুষমেধ' এবং 'সবমেধ' যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণের অশ্বমেধ অধ্যায়ে 'পিতৃমেধ' শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে 'পিতৃমেধ' এক প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান।

ঋগ্বেদের নানান্ সূক্ত হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেহকে আমরা অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিই (হে অগ্নে যঃ প্রেতঃ তে আহুতঃ চেতৌ মন্ত্রেণ সমর্পিতঃ।)

বৈদিক সাহিত্যে এবংবিধ বহু সূক্ত দাহপ্রথা প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়

যাহাতে মনে হয় আমাদের দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দাহানুষ্ঠানের মধ্য একটি গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। কেবলমাত্র সুবিধাজনক একটি ব্যবস্থারূপে অথবা এই ধরনের কোনও কারণে ভারতবর্ষে দাহপ্রথার প্রচলন ও প্রসারণ ঘটে নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যজ্ঞানুষ্ঠানে আমরা যে বিধি-নিয়ম পালন করিয়া থাকি, দাহানুষ্ঠানেও তদনুরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়। সুতরাং দাহপ্রথা আমাদের নিকট অগ্নিপূজারই নামান্তর এবং যজ্ঞপ্রথায় গভীর বিশ্বাস হইতে এই প্রথা এদেশে এমন একটি স্থায়ী ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছে।

বৃ ষো ৎ স র্গ

বৃষোৎসর্গ বৈদিক পশুযাগেরই অনুকল্প বলিয়া মনে হয়। রঘুনন্দন তাঁহার 'শুদ্ধিতত্ত্বে' বৃষোৎসর্গকে একটি যাগ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

যাগ তিন প্রকার—ইষ্টি, পশু ও সোম। বৃষোৎসর্গ পশুযাগের অন্তর্গত। রঘুনন্দন এই প্রসঙ্গে প্রথমে হরিবর্মার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হরিবর্মার মতে বৃষোৎসর্গ একটি যাগ। মুখ্যার্থে নহে, গৌণার্থে। ইহা একটি যাগ এই অর্থে যে ইহা একটি ত্যাগকর্ম। এই ত্যাগকর্মের বিধি বেদমেয় এবং স্বামিত্বের জনক না হইয়া হোমের অঙ্গ—'স্বামিত্বা জনক হোমাঙ্গক বেদমেয় ত্যাগরূপত্বাৎ অস্য যাগরূপত্বম্'। হরিবর্মার মতে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগের নাম যাগ—'দেবতোদ্দেশ্যেন দ্রব্যত্যাগঃ যজ্ঞপদার্থঃ।'

বৃষোৎসর্গে কিন্তু কোন দেবতার উদ্দেশ্যে বৃষ উৎসর্গ করা হয় না। এই কারণে মুখ্যার্থে বৃষোৎসর্গকে যাগ বলা যাইতে পারে না। মুখ্যার্থে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের নাম যাগ।

রঘুনন্দন কিন্তু হরিবর্মার এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে বৃষোৎসর্গ মুখ্যার্থেই যাগ। আপাতদৃষ্টিতে বৃষোৎসর্গে দেবতা দৃষ্ট না হইলেও মন্ত্রাত্মকরূপে তাহারা বর্তমান—'মন্ত্রস্যাপি দেবতাবিগ্রহ রূপত্বাৎ।' মন্ত্র, দ্রব্য এবং অগ্নিসংযোগকেই যজ্ঞ বলা হয়। বৃষোৎসর্গে যজ্ঞের এই তিনটি অঙ্গই সংযুক্ত

হইয়াছে। সুতরাং বৃষোৎসর্গ মুখ্যার্থেই যাগপদবাচ্য।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা মিতাক্ষরার মতেও বৃষোৎসর্গ একটি যাগ। 'বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু'—এইস্থলে 'যজ্ঞেষু' পদের অর্থ বৃষোৎসব। ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠানে আভ্যুদয়িক অবশ্য কর্তব্য। দ্বৈতনির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে—'আভ্যুদয়িকান্ আর্হ বৃষোৎসর্গ ইষ্টিত্বেনাবশ্যকম্'—যেহেতু বৃষোৎসর্গ একটি ইষ্টি সুতরাং তাহাতে আভ্যুদয়িকের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে আভ্যুদয়িকের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।

সুতরাং সেইদিনে আভ্যুদয়িক ভিন্নই বৃষোৎসর্গ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহা বিশেষ বিধি। সাধারণ নিয়ম হইল, ইষ্টিযাগে আভ্যুদয়িকের অনুষ্ঠান। যেহেতু বৃষোৎসর্গ একটি ইষ্টিযাগ সুতরাং তাহাতেও আভ্যুদয়িকের অনুষ্ঠান কর্তব্য। উশনার মতে মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে বৃষোৎসর্গ অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে বৃদ্ধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। কিন্তু সপিণ্ডীকরণের পর বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান হইলে তাহাতে অবশ্যই আভ্যুদয়িকের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আভ্যুদয়িক ইষ্টিযাগের অঙ্গ। বৃষোৎসর্গেরও অঙ্গ হইল আভ্যুদয়িক। সুতরাং বৃষোৎসর্গ ইষ্টি।

পারস্কর তাঁহার গৃহ্যসূত্রে প্রথমে শূলগবযাগের বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা গোযজ্ঞেরও বিধান করা হইল। এইরূপে গোযজ্ঞের নির্দেশ করিয়া পুনরায় তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, গোযজ্ঞের দ্বারা বৃষোৎসর্গও ব্যাখ্যাত হইল। বৃষোৎসর্গে গোযজ্ঞের অতিদেশ, আবার গোযজ্ঞে শূলগবের অতিদেশ। 'শূলগব' এবং 'গোযজ্ঞ' এই দুটিই যাগ। সুতরাং ইহাদেরই তুল্য বলিয়া বৃষোৎসর্গও অবশ্যই একটি যাগ, ইহাতে সন্দেহ নাই। 'পারস্করেণ শূলগবমভিধায় এতে নৈব গোযজ্ঞ ব্যাখ্যাত ইত্যাদিনা গোযজ্ঞমভিধায় অন্তে তত্তুল্য বয়া গোর্দীক্ষণা ইত্যুক্তা অর্থ বৃষোৎসর্গো গোযজ্ঞেন ব্যাখ্যাত ইত্যুক্তম্ ইতি'—রঘুনন্দনের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বৃষোৎসর্গানুষ্ঠানের জ্ঞানের জন্য গোযজ্ঞের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অপেক্ষিত, আবার গোযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জ্ঞানের জন্য শূলগব যজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অপেক্ষিত। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত শূলগব যাগের অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা পশুযাগেরই অনুরূপ। এই গৃহ্য পশুযাগ আবার শ্রৌতসূত্রোক্ত পশুযাগের অনুরূপ। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, বৃষোৎসর্গও একটি শ্রৌত পশুযাগেরই বিকৃতমাত্র।

শ্রৌত পশুযাগ, গৃহ্যপশুযাগ, শূলগব যজ্ঞ, গোযাগ এবং বৃষোৎসর্গ যাগের মধ্যে অনুষ্ঠানের দিক্ হইতেও অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃষের অভাবে মৃত্তিকানির্মিত বৃষ, পিণ্ড অথবা কুশও বৃষের প্রতীক বা প্রতিনিধি হইতে পারে। যদি ইহাদের কোনটিই পাওয়া না যায় তাহা হইলে যজমান হোমযাগের অনুষ্ঠান করিবেন। বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠানে হোমই প্রধান অঙ্গ। ইহা হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে বৃষোৎসর্গ একটি যাগ, সুতরাং ইহা বৈদিক অনুষ্ঠান।

প্রেতত্ব পরিহারের উদ্দেশ্যে যে বৃষোৎসর্গ বিহিত হইয়াছে তাহা স্মার্ত এবং পৌরাণিক। এই বৃষোৎসর্গ দুই প্রকারের হইতে পারে—কাম্য এবং নিত্য। একাদশাহাদিতে অনুষ্ঠিত বৃষোৎসর্গ নিত্য—'স চ কাম্যোনিত্যশ্চ যদকরণে প্রত্যবায়ঃ স নিত্যঃ একাদশাহাদৌ।'

কেবলমাত্র প্রেতত্ব পরিহারের জন্যই বৃষোৎসর্গ বিহিত হয় নাই। ইহার দ্বারা অন্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়া থাকে। পশু ও শস্য বৃদ্ধির জন্যও কালান্তরে ইহার অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। সম্ভবত আদিতে ইহা একটি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান ছিল। গৃহ্যসূত্রে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে যাহাদের জন্য নব এবং নবমিশ্র শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয় নাই তাহাদের প্রেতত্ব পরিহারের জন্য এই যাগ অনুষ্ঠিত হয়।

আরও পরবর্তীকালে নব এবং নবমিশ্র শ্রাদ্ধের ন্যায় সকল মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব পরিহারের জন্যই ইহা গৃহীত হয়। রঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন—'একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎ সৃজ্যতে বৃষঃ। প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং সংগচ্ছতি॥ আদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে। বৃষোৎসর্গশ্চ কর্তব্যোযাবন্ন স্যাৎ সপিণ্ডতা॥ অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েহ্নি যস্য নোৎসৃজ্যতে বৃষঃ। ন তস্য নিষ্কৃতির্দৃষ্টা দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি॥'

তাহা হইলে নব ও নবমিশ্র শ্রাদ্ধের দশা কি হইবে? যদি একমাত্র বৃষোৎসর্গের দ্বারাই প্রেতত্ব পরিহার সম্ভব হয় তাহা হইলে তো নব এবং নবমিশ্র শ্রাদ্ধ অনাবশ্যকই হইয়া পড়ে!

আমাদের মনে হয় বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান নব ও নবমিশ্র শ্রাদ্ধে সহায়কমাত্র। তাই সপিণ্ডীকরণের পর নব ও নবমিশ্র শ্রাদ্ধের দ্বারাই প্রেতত্ব পরিহার হইয়া গেলে বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বি বা হ ক থা

সমাজজীবনে বহুবিধ কর্ম অনুষ্ঠানাত্মক। বিচরণশীল মানুষের নিকট হয়ত এইসকল অনুষ্ঠান তেমন গুরুত্ব পায় নাই, কিন্তু সমাজবদ্ধ হইবার পরে, জীবনে একপ্রকার স্থিতি আসিবার পরে জন্ম হইতে মৃত্যু—এই সুদীর্ঘ পরিক্রমায় বহুবিধ অনুষ্ঠান আসিয়া তাহাকে পাইয়া বসে। সমাজবদ্ধ জীবের নিকট বিবাহ একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাই বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া দেশে দেশে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান প্রচলিত হইতে দেখা যায়।

এই অনুষ্ঠানাত্মক কর্মের সহিত সমাজের কিছু উন্নয়নের সম্পর্কও বিদ্যমান। অর্থাৎ যে মনুষ্যসমাজে উন্নয়ন তেমন কিছু ঘটে নাই সেই সমাজে অনুষ্ঠান-স্বল্পতা বুঝাইয়া দেয় যে ঐ সমাজ পিছাইয়া আছে। বিবাহের ব্যাপারে দেশে ও বিদেশে অনগ্রসর সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিলে সমগ্র চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এস্কিমোদের মধ্যে কোন পুরুষ কোন কন্যাকে লইয়া একত্র বাস করিলে তাহাদের বিবাহিত বলিয়া গণ্য করা হয়। সাঁওতালদের মধ্যে বরবধূ একত্র আহার করিলে কন্যা পিতৃকুল হইতে মুক্ত এবং শ্বশুরালয়ে সংযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। মালয়ে একত্র পানভোজন হইল বিবাহের একমাত্র অনুষ্ঠান। ব্রাজিলেও কয়েকটি জাতির

মধ্যে বরবধূ একত্রে মদ্যপান করিলেই বিবাহানুষ্ঠান পূর্ণ হয়। মলক্কার ওরাংবাসুয়া জাতির পুরুষ ও নারী একত্রে বসিয়া পরস্পরের করগ্রহণ করে এবং তাহাদের পিতা ও মাতা আসিয়া উভয়কে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন হইবার ও কলহ হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিয়া আশীর্বাদ করেন—ইহাতেই তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে কোন কোন অঞ্চলে বরবধূ পরস্পরের শোণিত দ্বারা চিহ্নিত করিয়া থাকে, আমাদের বধূদিগের সীমন্তে সিন্দুর ধারণকে ডালটন সাহেব ঐ শোণিতচিহ্নের সহিত যুক্ত বলিয়া অনুমান করেন।

বিবর্তনে বহু অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতি, বিশ্বাস ও সংস্কার ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তবুও কোন কোন নবপ্রবর্তিত প্রথার মধ্যে লক্ষ্য করিলে সনাতনের কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিলে পৃথিবীর প্রায় সবদেশের সকল মনুষ্যসমাজের কথা আসিয়া পড়ে। এই নবপ্রবর্তনে একটি নূতন সংযোজন যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হইল ধর্মীয় সংশ্রব। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানে ধর্ম আসিয়াছিল, কাজেই বিবাহের ন্যায় গুরুতর ব্যাপারে ধর্ম আসিবে—ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তাই নবদম্পতি অবশ্যই ধর্মসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আশীর্বাদ প্রথমে গ্রহণ করে। আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর সমাজে পৌরোহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসূচক অনুষ্ঠান কোন কোন ক্ষেত্রে না থাকিলেও সম্প্রদায় বা কোমের প্রতিষ্ঠিত দেবতার আশীর্বাদ বিবাহব্যাপারে অতি আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা ছাড়া অদৃশ্য অকল্যাণকর শক্তির প্রীত্যর্থে কতকগুলি অনুষ্ঠান পালিত হয়। যেমন দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান না করিয়া গঁদ জাতির কোন বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। এমনকি বিবাহ যাহাদিগের নিকট নেহাতই চুক্তি মাত্র, তাহারাও বিবাহের সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং দেবোদ্দেশে বেশ কিছু অনুষ্ঠান মানিয়া চলে।

সমাজশাস্ত্রীরা অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বিচরণশীল মানুষ স্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল এমন নহে। মরগ্যান, পোষ্ট, বেবেল এবং ম্যাকলেনান প্রভৃতি মনে করেন যে বিবাহ প্রথার জন্মের পূর্বে অগম্যগমন বা অনুরূপ কোন শব্দের অস্তিত্ব ছিল না, যৌনমিলন সেইসময়ে অবাধ ও নির্বিচার ছিল। কিন্তু এই বাধাহীনতারও একটি সুনিশ্চিত সীমারেখা ছিল। যে যাহাতেই উপগত হউক, তাহা সেই নারীপুরুষের নিজস্ব কোমের মধ্যে বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই হইতে হইবে। এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাকে সম্প্রদায়গত

বিবাহ আখ্যা দিয়াছেন। অন্ধকারময় সমাজেতিহাস কিঞ্চিৎ আলোকিত করিবার জন্য অনেকেই এই সম্প্রদায়গত বিবাহ লইয়া মাথা ঘামাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ধরনের বিবাহের ঠিক পরবর্তী স্তরেই আমরা বিভিন্ন সমাজের যে সাহিত্যিক নিদর্শন পাই তাহাতে কোন না কোনভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে সভ্য সমাজে স্বীকৃত বিবাহ প্রথার জনক বলিয়া কীর্তিত হইতে দেখি। নজ্যাভিস্ এবং আভজিস্ ল্যাপল্যাণ্ডে, মিশরে মিনিস, গ্রীসে কিক্রপ্‌স্ চীনে ফোহি এবং ভারতবর্ষে শ্বেতকেতু সম্ভবতঃ প্রথম বিবাহ প্রথার প্রচলন করেন।

বিশ্বের বহু প্রাচীন সাহিত্যে স্বেচ্ছাবিহারী মানুষ সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। হেরোডোটস্ এবং ষ্ট্রাবো 'মেসাজিটি' নামে এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেক পুরুষের নিজস্ব স্ত্রী থাকিলেও সেই জাতির যে কোন পুরুষ তাহাতে উপগত হইতে পারিত। আবার 'অসকান'দের মধ্যে নারীগণ ছিল সাধারণের সম্পত্তি। এইরূপ অসংখ্য তথ্যের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক বিবাহের অনুমান নিঃসন্দেহে দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে।

অগ্রসর সমাজে নরনারীর সম্পর্কটি শেষপর্যন্ত কয়েকটি বিধি ও নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। দেশ ও কালভেদে এই বিধিনিষেধের কিছু তারতম্য ঘটিলেও অঞ্চল বিশেষের নরনারী যখন এই বিধিনিষেধ মানিয়া উভয়ে মিলিয়া পরিবার রচনা করেন তখন তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হয়।

বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও জাতি অনুযায়ী কতকগুলি বিভাগ বর্তমান। ইহার উপর আবার শাখা, গোত্রের বিভাগও বড় কম নাই। সমাজশাস্ত্রীগণ বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্বাচনে ঐ বিভাজন সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে বসেন। হিন্দুর পক্ষে এই বিচারপর্ব স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মসংহিতার নির্দেশ অনুসারে সমাধা করা হয়। মূলীভূত বেদবাক্য স্মৃত হইয়াছে যাহাতে তাহাই স্মৃতি। বেদে যাহা কর্তব্য হিসাবে প্রনিহিত হইয়াছে তাহা হইল ধর্ম। 'বিবাহ' পদটির সহিত বহ্‌ ধাতুর একটি যোগ রহিয়াছে। পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া রঘুনন্দন বলিলেন—'ভার্যাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহ'—অর্থাৎ বর কর্তৃক কন্যার ভার্যাত্বসম্পাদক গ্রহণের নামই বিবাহ। সম্বন্ধনির্ণয়কার গোপালের অবশ্য বিবাহের সংজ্ঞা অন্যরূপ। তিনি বলিলেন—'পিত্রাদিকর্তৃক কন্যোৎসর্গানন্তরং বরস্বীকারো বিবাহ'। স্পষ্টতই বর-বধূর পারস্পরিক সম্বন্ধের সামাজিক স্বীকৃতিকেই তিনি অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

পাত্র-পাত্রীর বিবাহযোগ্য বয়স সম্পর্কেও স্মৃতিকারগণ ঐকমত্য নহেন। সাধারণতঃ বলা হয় যে পাত্রের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন সমাপ্তির পরবর্তী কালই বিবাহের প্রকৃষ্ট সময়। এই অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় কখন? উপনয়নের পর। কিন্তু উপনয়ন সকল বর্ণে তো একই বয়সে হয় না?

পাত্রীর বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে তাহার রজোদর্শনের একটি মুখ্য ভূমিকা রহিয়াছে। সে পিতৃগৃহে রজোদর্শন করিলে পিতামাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরকগামী হইবেন। তাহাকে যে বিবাহ করিবে সে শূদ্রতুল্য বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইবে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে ত্রৈবর্ণিকের ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহের বয়স একরূপ কিন্তু শূদ্রের ক্ষেত্রে তাহার কোন সীমা নাই। রঘুনন্দনের যে নির্দেশ—কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স ন্যূনকল্পে আট বৎসর কিন্তু বারো বৎসরের অধিক নহে—ইহা ত্রৈবর্ণিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—শূদ্রের ক্ষেত্রে নহে। পূর্বাচার্য মনু কন্যার বিবাহযোগ্য বয়সের উপরি উল্লিখিত মত পোষণ করিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন যে নির্গুণ পাত্রে কন্যাদান অপেক্ষা কন্যার আজীবন পিতৃগৃহে বাস করাও শ্রেয়। উৎকৃষ্ট পাত্র পাইলে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যারও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট বলিতে মনু পাত্রের কুলশীল ইত্যাদিই বুঝাইয়াছেন।

অশুভকর বা পদচিহ্নযুক্ত কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ব্যতিরেকে পাত্রীর সাধারণ যোগ্যতা হইল 'কান্তা' হওয়া—অনন্য পূর্বিকাং কান্তাম্ (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১।৩।৫২)। কান্তা পদের ব্যাখ্যায় শ্রীনাথ আপস্তম্বের মত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—'বোঢুর্মনশ্চক্ষুষোরানন্দ করীং, যস্যাং মনশ্চক্ষুষো-নির্বন্ধস্তস্যাং ঋদ্ধিরিত্যাপস্তম্বস্মরণাৎ।' অর্থাৎ যে পাত্রীকে দেখিলে পাত্রের নয়নমন তৃপ্ত হয় সেই বিবাহযোগ্যা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গোত্রান্তর, পাত্রপাত্রী নির্বাচন, এমনকি মূল যে প্রশ্ন বিবাহ কি—সে বিষয়েও স্মৃতিকারগণ দেশভেদে এবং কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

বিবাহ যে কতকগুলি অনুষ্ঠানের সমষ্টি, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ বা মতানৈক্য নাই। কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানসমষ্টির মধ্যে বস্তুত কোন্‌টি প্রধানতম সে বিষয়ে কি স্মৃতিকারগণ একমত পোষণ করেন? স্মার্ত রঘুনন্দন বলিলেন—পিতৃগোত্র হইতে কন্যা পতির গোত্রে গোত্রান্তরিতা হইলেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, গোত্রান্তর ঘটে কখন? কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে? কেহ বলিলেন—'স্বগোত্রাদ

শ্রুতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে'—অর্থাৎ সপ্তপদী গমনের পর কন্যার গোত্রান্তর ঘটিয়া থাকে। বৃহস্পতির মতে কিন্তু পাণিগ্রহণের পরই নারীর গোত্রান্তর হয়। অপর আর একটি মত হইল, যতকাল অবধি বিবাহিতা নারীর সপিণ্ডীকরণ না হয় ততকাল তাহাতে পিতার গোত্রই বহাল থাকে। বিস্তৃত ভাবে সাপিণ্ড্যবিচারের অবকাশ এখানে নাই। এই নিবন্ধে আমি কেবল মাতুল কন্যার বিবাহ বিষয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শৈশবে শুনা যায় বাঙালীর গৃহে সাতপুরুষের কমে পরিণয় সম্বন্ধ হইতে পারে না। ইংরেজী উপন্যাসের পৃষ্ঠায় ইংরেজ বালক বালিকাকে কাজিনের প্রেমে পড়িতে দেখা যায়; এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত অন্যান্য জাতি, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও সেই প্রথার সদ্ভাবের কথা অবগত হওয়া যায়। ইহুদি, খ্রীষ্টান, পার্সি, মুসলমান প্রভৃতি পৃথিবীর তাবৎ জাতিরই মধ্যে এই রীতি প্রচলিত জানা যায়—কেবল হিন্দু ছাড়া; এবং মনে করা যায় ইহাই বুঝি হিন্দুর 'হিন্দুত্বের' আর একটি বিশেষ পরিচয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটি দুইটি করিয়া হিন্দু-দম্পতির সহিত সাক্ষাৎ হয়, শুনা যায় যাঁহাদের রক্তের সম্পর্ক সাতিশয় নিকট, যাঁহাদের মধ্যে সাতপুরুষের অপেক্ষা অনেক কম ব্যবধান। লোকমুখে আরও অনেক এরূপ মিলনের সংবাদ লাভ করা যায়। তখন ধারণা হয়, এতদূরও সম্ভব, কিন্তু হিন্দুর কখনও First Cousin-এর সহিত বিবাহ হয় না। দেশভ্রমণে নির্গত হইয়া, এই শেষভ্রান্তিটুকুও চূর্ণ হয়। বাঙালী অপেক্ষা যাঁহারা আচারে-বিচারে সহস্রগুণ বেশী হিন্দু, সেই দাক্ষিণাত্যনিবাসী এবং মহারাষ্ট্রের কোন কোন প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণের রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখা যায় মাতুলকন্যা বা পিতৃষ্বস্রেয়ী কন্যার সহিত বিবাহ সেখানকার ব্রাহ্মণকুমারের পক্ষে এক অনিন্দ্য, নিত্যঘটনার মধ্যে। যখন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায় কোন্ শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হন, সেই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমতঃ ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের তাঁহারা উল্লেখ করেন—

আয়াহীন্দ্র পথিভিরীড়ীতেভির্যজ্ঞমিমম্ নো ভাগধেয়ংজুষস্ব।
তৃপ্তাম্ জহুর্মাতুলস্যেব যোষা ভাগস্তে পৈতৃষ্বস্রেয়ীব পামিব॥

[৫ অষ্টক, ৪র্থ অধ্যায়, ২২ বর্গ, পরিশিষ্ট ষষ্ঠ ঋক্]

অন্বয়ার্থঃ—ইন্দ্রঃ পথিভিঃ ঈড়ীতেভিঃ স্তুতৈঃ সহ নো অস্মাকং ইমম্ যজ্ঞম্ আয়াহি,

আগত্য অস্মাভির্দীয়মানং ভাগধেয়ং জুষস্ব। তৃপ্তাম্ আজ্যাদিনা সংস্কৃতাং বপাং ত্বাং উদ্দিশ্য জহ ত্যক্তবন্তঃ। অত্র দৃষ্টান্তদ্বয়ং যথা মাতুলস্য যোষা দুহিতা দৌহিত্রস্য ভাগঃ ভজনীয়া ভাগিনেয়েন পরিণেতুং যোগ্যেত্যর্থঃ—যথাচ, পৈতৃষ্বসেয়ী পৌত্রস্য ভাগঃ, তথা অয়ং তে ভাগো বপাখ্য ইতি।

অর্থাৎ হে ইন্দ্র পিতৃষ্বসেয়ী কন্যা বা মাতুলদুহিতা বরের পক্ষে যেমন মহার্ঘ্যা সর্বাঙ্গসুন্দর পাত্রী, তোমার জন্য তেমনি এই উৎকৃষ্ট বপা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তুমি স্বস্তি মার্গে আমাদের যজ্ঞে আসিয়া তোমার এ ভাগ গ্রহণ কর।

এই ঋকে এরূপ বিবাহ যে আর্যগণের মধ্যে অতি শ্লাঘ্য বলিয়া গণ্য হইত তাহাই প্রমাণ হইতেছে।

পণ্ডিত প্রবর চন্দ্রকান্ত তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত, মাধবকৃত পরাশর স্মৃতির টীকায় মনুর বচনও যে এবিবাহের অবিরোধী তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। মনু বলিতেছেন—

"অসপিণ্ডা যা চ মাতুঃ অসগোত্রাচ পিতুঃ
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণিমৈথুনে।"

এখন মায়ের সপিণ্ডা আর অসপিণ্ডা কে? ভর্তৃকুলে মায়ের পিণ্ড, পিতৃকুলে নয়। তাহার বচন :—

"একত্ব সা গতা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে
স্বগোত্রাৎ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।"

সপ্তপদী হইবার পর স্ত্রী স্বামীর পিণ্ড, গোত্র ও অশৌচ সকলই পায়। পিতৃকুলের গোত্র আর তার নিজের থাকে না।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে উল্লিখিত মনুর বিধির প্রথম চরণে দুইটি 'চ' আছে, সেই দুই 'চ'র অর্থ এই :—

"যা মাতুঃ অসপিণ্ডা,
যা পিতুঃ অসপিণ্ডাচ অসগোত্রাচ"।

তাহা হইলে 'মাতুঃ অসপিণ্ডা' একথাটাতো নিরর্থক, কেন না যে পিতার অসপিণ্ডা সে মাতারও অসপিণ্ডা, যেহেতু পিতামাতার পিণ্ড একই। সে আপত্তি খণ্ডনের জন্য বলা হইতেছে মাতুঃ অসপিণ্ডা কথাটা নিরর্থক নয়। ব্রাহ্ম বিবাহে যেখানে কন্যা সম্প্রদান হয়, সেইখানেই কন্যার গোত্র পিণ্ডাদি বদলায়; কিন্তু গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে কন্যা যেখানে নিজে স্বামী বরণ করে সেখানে তাহার গোত্রাদি বদলায়

না; পিতৃগোত্রাদিই বজায় থাকে। সুতরাং যেখানে ব্রাহ্মবিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছে সেখানে মাতুলকন্যা অথবা পিতৃষসেয়ী কন্যা মাতার সগোত্রাও নয়, সপিণ্ডাও নয়। শুক্ল যজুর্বেদে পাওয়া যায়:—

"তস্মাদ্বা সমানাদেব পুরুষা দত্তাচাত্তশ্চ জায়তে
উত তৃতীয়ে সঙ্গচ্ছাবহৈ চতুর্থে সঙ্গচ্ছাবহৈ।

একই পুরুষ হইতে ভোগ্য এবং ভোক্তা দুই জন্মগ্রহণ করে এবং তাহারা এই সংকল্প করে যে, "কূটস্থং (common ancestor) আরভ্য তৃতীয়ে চতুর্থে বা পুরুষে সঙ্গচ্ছাবহৈ।" অর্থাৎ একই লোকের পুত্র ও কন্যার পুত্রকন্যারা তৃতীয় পুরুষ। সুতরাং তাহারা বিবাহ করিতে পারে, চতুর্থ পুরুষেও পারে। তাই পরাশর মাধব বলিতেছেন এই শ্লোক হইতে "মাতুলসুতাং বিবহেৎ বিবাহো কর্তব্য ইতি বিধিরনুকল্প্যতে, অস্মাৎ শাস্ত্রানুগৃহীতোয়ং বিবাহঃ।"

যদি আর্যদের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল, তবে আর্যাবর্ত হইতে ইহা উঠিয়া গেল কেন? এ তথ্য অনুসন্ধেয়। যে কারণেই হউক আর্যাবর্ত হইতে এ প্রথার বিলোপও যে দীর্ঘকালীন তাহার প্রমাণ বোধায়ণ ধর্মসূত্র। বোধায়ণ উক্তগ্রন্থের একস্থানে বলিতেছেন:—

"পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তিঃ। দক্ষিণতঃ

১. অনুপনীতেন। ২. ভার্য্যয়া সহ ভোজনং। ৩. পর্য্যুষিত ভোজনং। ৪. মাতুলদুহিতৃ। ৫. পিতৃষস্দুহিতৃ পরিণয়নং।

অথোত্তরতঃ

১. উর্ণ বিক্রয়ঃ ২. শীধুপানং ৩. উভয়তোদৎভিঃ ব্যবহারঃ ৪. আয়ুধীয়কং ৫. সমুদ্রযানং।

ইতর ইতরস্মিন্ কুর্ব্বন দুষ্যতি। ইতর ইতরস্মিন্ দেশ প্রামাণ্যাদিতি। ব্যাখ্যানং —ইতরো দাক্ষিণাত্য ইতরস্মিন্ উত্তরদেশে মাতুল সম্বন্ধং কুর্ব্বন্ দুষ্যতি ন স্বদেশে। ইতর উদীচ্যঃ ইতরস্মিন্ দক্ষিণদেশে শীধুপানাদিকং কুর্ব্বন্ দুষ্যতি, ন স্বদেশে। কুতঃ দেশ প্রামাণ্যাৎ দেশনিবন্ধনত্বাৎ আচারস্যেত্যর্থঃ।

ইহার মর্ম এই যে দক্ষিণ ও উত্তরে পাঁচ প্রকার প্রথা আছে যাহা পরস্পরের সহিত মেলে না।

যেমন দক্ষিণে।

১. অনুপনীতের সহিত ভোজন ২. ভার্য্যার সহিত ভোজন ৩. বাসি ভাত

খাওয়া ৪. মাতুল দুহিতাকে বিবাহ ৫ সমুদ্রযান।

এসবই ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলা হইতেছে জানিতে হইবে। বোধায়ন তারপর বলিতেছেন দক্ষিণের লোকে উত্তরে যাইলে তাহার দক্ষিণী ব্যবহার বজায় রাখা উচিত নয়, উত্তরের ব্যবহার গ্রহণ করা উচিত; এবং উত্তরের লোক দক্ষিণে আসিলে তাহার উত্তরের আচার পরিত্যাগ এবং দক্ষিণের আচার গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ রোমেতে রোমনের আচরণই অনুসরণীয়।

আমরা আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণেরা উর্ণ বিক্রয় করিতাম, অস্ত্রধারণ করিতাম, এবং বিশেষতঃ সমুদ্রযান করিতাম—অথচ সপ্তন্যূন পৌরুষেয় বিবাহ প্রথা বর্জন করিয়াছিলাম, সে কত কালের কথা।

বেদে নারীর অধিকার

প্রাচীন ভারতে, শাস্ত্রশাসিত সমাজে, বেদে নারীর অধিকার বিষয়ে, প্রধান ভাবে দুইটি পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক মতে নারীগণ বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বা বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, সাবিত্রীমন্ত্র, প্রণব, যজুর্মন্ত্র প্রভৃতি উচ্চারণে অনধিকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন[১]। অন্যমতে পুরুষের ন্যায়ই বেদাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে নারী ও সম্পূর্ণরূপে সমানভাবে অধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি মতের অস্তিত্ব পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রকার আচার্য জৈমিনি এবং প্রাচীন ভাষ্যকার শবরস্বামী ও স্বীকার করিয়াছেন[২]। তাঁহাদিগের সময়েও প্রশ্ন উঠিয়াছিল স্ত্রীজাতি বেদাদি শাস্ত্রে এবং বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে পুরুষের ন্যায়ই সমানভাবে অধিকারী কিনা। পূর্বপক্ষে বলা হইয়াছিল 'স্বর্গকামো যজেত' 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, তম্ অধ্যাপয়ীত' প্রভৃতি বিধিবাক্যে পুংলিঙ্গের নির্দেশ থাকাতে উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে একমাত্র পুরুষেরই অধিকার। নারীর নহে। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা

১। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীঃ স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি—নৃসিংহ-তাপন্যুপনিষৎ।

২। পূর্বমীমাংসা, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথমপাদ, তৃতীয় অধিকরণ।

হইল এইসকল বিধিবাক্যে লিঙ্গ অবিবক্ষিত অর্থাৎ যেই লিঙ্গেরই নির্দেশ থাকুক না কেন বিধিগুলি সামান্যভাবেই করা হইয়াছে। লিঙ্গের কোনও বিশেষ গুরুত্ব নাই। উপনয়নাদি বিধিই ঐ সকল বিধিবাক্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার। দম্পতির সহাধিকারের ত কথাই নাই[1] পৃথক ভাবেও নারীর বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে অধিকার রহিয়াছে। এই কারণেই আমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী প্রভৃতিকে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে দেখিতে পাই। এই কারণেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যেও অম্ভৃণ ঋষির কন্যা 'বাক্' দেবীকেও দেখিতে পাই। মন্ত্রদ্রষ্ট্রীগণের মধ্যে নারী ঋষির নামের অভাব নাই। 'কঠি', 'কলাপী', 'বহ্বৃচী' প্রভৃতি বেদের শাখাধ্যেতৃবাচক পদগুলিও নারীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারেরই সাক্ষ্য বহন করে। প্রাচীন স্মৃতিকার গোভিলাচার্য তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বিবাহস্থলে আনীতা কন্যাকে বিবাহের পূর্বে যজ্ঞোপবীতিনী রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন।[2] এইরূপ বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, গোভিলের মতে বিবাহের পূর্বে কন্যা অবশ্যই উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃতা যজ্ঞোপবীতধারিণী হইবেন। গোভিলাচার্য আবার সেই কন্যার দ্বারা বেদমন্ত্র পাঠও করাইয়াছেন।[3] বশিষ্ঠ ঋষিও তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থে নারীর জন্য সাবিত্রীমন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবার বিধান করিয়াছেন।[4] আরও, যজমান পত্নী যদি বেদাদি শাস্ত্রে নিতান্ত অজ্ঞই থাকিতেন তাহা হইলে যজ্ঞসময়ে ঋত্বিক্ প্রভৃতি যাহা নির্দেশ করিতেন তাহার যথাযথ অনুষ্ঠান করা তাঁহার পক্ষে কখনও সম্ভব হইত না। সুতরাং জৈমিনি এবং তাঁহার অনুবর্তিগণের মতে পুরুষের ন্যায় নারীর জন্যও উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে।

১। পূর্বমীমাংসা, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথমপাদ, চতুর্থ অধিকরণ ও পানিনি অষ্টাধ্যায়ী-পত্যুর্নোযজ্ঞসংযোগে ৪।১।৩৩।

২। প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্ অভ্যুদানয়ঞ্জপেৎ – গোভিলগৃহ্যসূত্র ২।১।১৯।

৩। 'পশ্চাদগ্নেঃ সংবেষ্টিতংকটম্, এবং জাতীয়ং বা হন্তৎ, পদা প্রবর্তয়ন্তীং বাচয়েৎ—প্র মে পতিয়ানঃ পন্থাঃ কল্পতাম্'—গোভিলগৃহ্যসূত্র ২।১।২০।

৪। 'মনসা ভর্তুরতিচারে ত্রিরাত্রং যাবকং ক্ষীরোদনং বা ভুঞ্জানাহধঃ শয়ীত ঊর্ধ্বং ত্রিরাত্রাদপ্সু নিমগ্নায়াঃ সাবিত্র্যাহষ্টশতেন শিরোভির্জুহুয়াৎ পূতা-ভবতি'—বশিষ্ঠস্মৃতি ২।৫।

জৈমিনির পরবর্তী স্মৃতিকারগণ আবার নূতনভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যেও আবার এই প্রশ্নের মীমাংসার পক্ষে দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায়। পরাশর স্মৃতির ভাষ্যকার মাধবাচার্য তাঁহার গ্রন্থে এই দুইটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। একমতে নারীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—১. ব্রহ্মবাদিনী এবং ২. সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীগণের জন্যই উপনয়ন, অগ্নীন্ধন, বেদাধ্যয়ন, স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যা প্রভৃতি বৈদিক অনুষ্ঠান। আর যাঁহারা বধূ হইবেন তাঁহাদিগের বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কোনও রূপে উপনয়ন সংস্কার মাত্র করিয়া বিবাহকার্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে। এই সদ্যোবধূগণের জন্যই মনু বলিয়াছেন 'পতিসেবাই নারীর গুরুকুলে বাস, গৃহকার্যই তাহার অগ্ন্যাহুতি।' হারীত এই মতের পরিপোষক। অপর মতের সমর্থক স্মৃতিকার যম। যমের মতে নারীর বেদে অধিকার এই যুগের জন্য নহে। ইহা 'কল্পান্তর বিষয়ক।' পুরাকালে কুমারীগণের মৌঞ্জী বন্ধন, বেদাধ্যয়ন ও বেদের অধ্যাপনা, গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি সকল বৈদিক অনুষ্ঠানই পুরুষের ন্যায় তুল্যভাবে বিহিত ছিল। বিশেষ এই যে, পিতা, পিতৃব্য বা ভ্রাতা ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট কুমারী বেদাধ্যয়ন করিতে পারিত না। ভৈক্ষচর্যা স্বগৃহেই করিতে হইত। এবং অজিন, চীর এবং জটাধারণ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। স্মৃতিকার মাধবাচার্যও যমের মতই সমর্থন করিয়াছেন।[১]

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলেও স্মৃতিকার যমের মতই সমর্থনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঋগ্বেদের যুগে বিশ্ববারা[২] প্রভৃতি নারী যজ্ঞাদিতে ঋত্বিকের কার্য করিতেছেন এবং তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি। ঘোষা[৩], লোপামুদ্রা[৪]

১। "দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়নম্ অগ্নীন্ধনম্ বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা।" ইতি। বধূনাংতু পস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্যঃ ইতি। নৈবম্। তস্য কল্পান্তর-বিষয়ত্বাৎ। তথাচ যমঃ—পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জী-বন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥ পিতা পিতৃব্যোভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ। স্বগৃহে চৈব কন্যায়াঃ ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে॥ বর্জ্জয়েদজিনংচীরংজটাধারণমেবচ॥ মাধবাচার্য পরাশরভাষ্য।

২। ঋগ্বেদ ৫।২৮।

৩। ঐ ১০।৩৯।

৪। ঐ ১।১।১৭৯।

এবং অপলা[১] প্রভৃতিও মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি হইয়াছেন। অপলা তাঁহার চর্মরোগের জন্য স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রদেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সোমাহুতি প্রদান করিয়া ঐ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ব্রাহ্মণযুগে নারী যদিও পৃথক্ ভাবে ঋত্বিকের কার্য করিতে অধিকারী ছিলেন না তথাপি পত্নীরূপে স্বামীর সহিত প্রধান প্রধান যজ্ঞেও অংশ গ্রহণ করিতেন। বাজপেয় যাগ প্রসঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে।[২] সাবিত্রীদীক্ষা নিষিদ্ধ হইলেও বেদাধ্যয়ন তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। বেদের কর্মকাণ্ডে তাহাদিগের পৃথক্ অধিকার কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও দম্পতির সহাধিকারে এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় তাঁহারা ঋগ্বেদের যুগের ন্যায়ই অধিকারী ছিলেন। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অতি গভীর জ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন এবং ঋষিকন্যা গার্গী এই পরমতত্ত্বদর্শী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁহার সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করিয়া দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করিতেছেন।

ইহার পর সূত্রযুগে নারী তাহার সকল প্রকার বৈদিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়া শূদ্রতুল্য হইয়াছে। আপস্তম্ব তাহাদিগের সাবিত্রীদীক্ষা, যজ্ঞোপবীত ধারণ, পক্বান্ন বলি প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিলেন।[৩] বিষ্ণু ও আশ্বলায়ন বলিলেন, স্ত্রীজাতির জাতকর্ম, নামধেয়, আদিত্যদর্শন, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ অমন্ত্রক হইবে।[৪] বিবাহই কেবল নারীর সমন্ত্রক সংস্কার। বৌধায়ন বলিলেন, নারীর বৈদমন্ত্রে অধিকার নাই।[৫] গৌতম বলিলেন, বৈদিক অনুষ্ঠানে নারীর স্বাতন্ত্র্য নাই।[৬] বশিষ্ঠের মতে নারীর আচমনেও অধিকার নাই।[৭] তাহারা কেবল ওষ্ঠদ্বয়ে জলস্পর্শন করিলেই আচমনের কার্য হইবে। মনু বলিলেন—বিবাহই নারীর একমাত্র বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকার্যই তাহার

১। ঋগ্বেদ ৮।৮০।
২। শতপথ ব্রাহ্মণ—৫।২।১।১০।
৩। আপস্তম্ব—১।১।১।৮ ও ২।৭।১৫।১৮।
৪। বিষ্ণু—২৭।১৩-১৪ ; আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।১৬।১৬।
৫। বৌধায়ন ১।৫।১১।৭।
৬। ১৮।১।
৭। বশিষ্ঠ ৩।৩৪।

অগ্নিক্রিয়া। যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি কোন ধর্মকার্যেই তাহার স্বতন্ত্র অধিকার নাই। পতি সেবাই তাঁহার একমাত্র ধর্মানুষ্ঠান।[১]

ঋগ্বেদের ঋষিকন্যা বাক্ ঘোষণা করিয়াছিলেন—'আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি, আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি। মিত্র ও বরুণ উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। ইন্দ্রকে, অশ্বিদ্বয়কেও আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। আমি ব্রহ্মদ্বেষীর নাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করিয়াছি। আমি জনহিতার্থে সংগ্রাম করি। আমি দ্যাবা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি। ঊর্ধ্বভাগে দ্যৌকে প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে; বিশ্বভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি, দ্যুলোককে আমি স্বদেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি। বিশ্বভুবন নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্বত্র প্রবাহিত হই। পৃথিবীর পরে দ্যুলোকের পরে যাহা কিছু বিদ্যমান, সর্বত্র আমি আমার মহিমার দ্বারা সম্ভূত হই। আমি চিন্ময়ী, জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ধূলিকণায় আমিই বিদ্যমান রহিয়াছি।'[২] ঋষিকন্যার এই আমিত্বের প্রসারের ছায়া অবলম্বন করিয়াই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের এবং দেবী মাহাত্ম্যে দেবীর সর্বব্যাপিনী রূপের কল্পনা করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ী অমরত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম'[৩]—সেই বিদ্যা, সেই জ্ঞানের দ্বারা আমি কি করিব যাহার সাহায্যে আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইব না?

যে নারী মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া অমরত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল যে নারী মরণশীল হইয়াও মনুষ্যসুলভ মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, যে নারী ক্ষুদ্র নারী হইয়াও আপনাকে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত মিলাইয়া দিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিল—'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি'—আমি রুদ্রগণ এবং বসুগণের সহিত বিচরণ করি, এ জগতে আমিই অদ্বিতীয়। এ জগতে আমি ভিন্ন আর কে আছে—'একৈবাহং জগত্যত্র, দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—সেই নারীই পরবর্তী কালে বেদের অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইল, ইহা একান্তই ভাগ্যের পরিহাস। অনুসন্ধিৎসুগণ অবশ্যই ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

১। মনু ২.৬৭।

২। ঋগ্বেদ—দশমমণ্ডল—১২৫ সূক্ত—(দেবীসূক্ত)।

৩। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

বৈদিক চিন্তায় ভিন্নসুর

যাঁহাদের ধারণা ভারতবর্ষ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান, এই দেশের সহিত তাঁহাদের পরিচয় অসম্পূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীতে বস্তুবাদ যেমন প্রবল ও সর্বাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে, একদা ভারতভূমিতেও এই চিন্তাধারা সমভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। ভারতের চিন্তারাজ্যে যদিও আধ্যাত্মিকতার প্রভুত্ব অব্যাহত ছিল, তথাপি ইহাও স্মরণীয় যে, এই সনাতন ভূমিতে এমন সব চিন্তানায়কের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল যাঁহাদের মতামত ছিল প্রচলিত বিশ্বাস ও দর্শনাদির বিপরীতধর্মী। এইভাবে এক পৃথক্ ধারার চিন্তাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়, যাহা সাধারণভাবে চার্বাক দর্শন বলিয়া অভিহিত।

চার্বাক সম্প্রদায়ের মূল পুঁথিগুলি আজ আমাদের কাছে লুপ্তপ্রায়। তাঁহাদের মতামত বা উক্তিবিশেষের ভগ্নাংশ হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন শাস্ত্রাদির মধ্যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। বলিতে গেলে এই অবলুপ্ত উদ্ধৃতিগুলিই বর্তমানে চার্বাক দর্শনের পরিচয়-সম্বল।

বৃহস্পতি লৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলিয়া ঘোষণা করেন। ভাবিলে ভুল হইবে না যে, ভারতীয় বস্তুবাদ প্রাথমিক স্তরে সংশয়বাদ ও নেতিবাদের সহিত মিশ্র অবস্থায় ছিল। ইহার সুস্পষ্ট আকার দেন বৃহস্পতি।

ঋগ্বেদে বৃহস্পতি 'গণপতি' বলিয়া অভিহিত—এক সাংগীতিক গোষ্ঠীর অধিনায়ক—কবীনাং কবিঃ। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী। এই কারণে তাহাদিগকে বার্হস্পত্য বা লোকায়তিক বিশেষণে উল্লেখ করা হয়। বৃহস্পতি আজ বিস্মৃতির নেপথ্যে অদৃশ্য। চার্বাকরা কিন্তু এখনও আলোচনার বিষয়।

ভারতের ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চার্বাক মতবাদের প্রতিভূদের সন্ধান পাওয়া যায়। রামায়ণের জাবালিমুনি ছিলেন বস্তুবাদের আচার্যবিশেষ। রামের উদ্দেশে তাঁহার উপদেশাবলী চার্বাক মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। মর্ত্যভূমির অধীশ্বর অপেক্ষা উর্ধ্বতন কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই—ভাষান্তরে ইহা চার্বাকের উক্তি। হরিবংশের রাজা বেণ এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন বেদবিরোধী। ব্যাস তাঁহাকে বিধর্মী আখ্যা দিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের মতে অজিতকেশকম্বলী ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তাঁহার উপদেশাত্মক উক্তিগুলির সঙ্গে চার্বাক সম্প্রদায়ের মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অজিতের অনুবর্তী পায়াসি গুরুর মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে জানা যায় যে, ভাগুরি ছিলেন চার্বাক-মতের একজন প্রখ্যাত উদ্গাতা। শান্ত রক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহে উল্লিখিত পুরন্দর ছিলেন সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভুক্ত। প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য বলিয়া তিনি অনুমানকে সত্যজ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে আংশিকভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। হরিভদ্রসূরি-প্রণীত ষড়দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন বলেন, কোন কোন চার্বাক আকাশকেও ভূত হিসাবে স্বীকার করিয়া থাকেন, সদানন্দ তাঁহার অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও সর্বশেষ মনশ্চৈতন্যবাদের প্রবর্তন করেন চার্বাক সম্প্রদায়ের উত্তরসূরিরা। প্রাচীন নাস্তিক্যবাদের প্রবল শত্রু বুদ্ধোত্তর যুগের ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে এই সকল নূতন মতবাদ প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। 'কামসূত্রে'র লেখক বাৎস্যায়নও সম্ভবতঃ এই যুগেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিজে বস্তুবাদী ছিলেন না, তথাপি ইন্দ্রিয়োপভোগের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার মতামত সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়ের উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জ্ঞানতত্ত্ব : চার্বাকদের দার্শনিক চিন্তা তাঁহাদের বিশিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বের উপর ভিত্তি

করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্য জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই সত্য, যাহা কিছু প্রত্যক্ষের অতীত তাহাই সংশয়িত। ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ বলিয়া অনুমানকে তাঁহারা সত্যজ্ঞানের মাধ্যম বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, কোন এক বিশেষ 'ক' কোন এক বিশেষ 'খ' এর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাহা হইতে অপ্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া কেমন করিয়া এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, সব 'ক'-এর সঙ্গে সব 'খ' সম্পর্কিত? এই ধরণের জ্ঞান এই কারণে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার্য নহে।

আপ্তবাক্যও নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা আপ্তবাক্যের যাথার্থ্য অনুমানের সাহায্যে নিরূপিত হয়। পরন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে, এই ধরণের আপ্তবাক্যগুলি যুক্তিবিবর্জিত ও স্বকপোলকল্পিত। এমন কি বেদাদিও নির্ভরযোগ্য নয়। বেদগুলি দ্ব্যর্থক, অবাস্তব ও পরস্পরবিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ। একটি বিধিবাক্যে যে ক্রিয়াপদ্ধতি বিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট, অপর বিধিবাক্যে তাহাই নিন্দার্হ বলিয়া বর্ণিত। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে যে সকল ফলশ্রুতির আশ্বাস দেওয়া আছে তাহা কস্মিন্‌কালেও সার্থক হয় না।

কিন্তু অনুমানকে সর্বতোভাবে বর্জন করিলে প্রাত্যহিক জীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই কারণে সুশিক্ষিত চার্বাকরা অনুমানকে জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তবে ইহার ক্ষেত্র পরিদৃশ্যমান বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা অনুমানকে দ্বিবিধভাগে ভাগ করিয়াছেন—অতীত সম্পর্কিত ও ভবিষ্যৎনির্দেশক। তাঁহারা প্রথমোক্ত অনুমান স্বীকার করিয়া দ্বিতীয়োক্ত অনুমান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাহা কোনকালে প্রত্যক্ষগোচর নয় তাঁহারা এমন অনুমানকে বর্জন করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য 'সম্ভাব্য জ্ঞান' স্বীকার করিয়া লইলেই যথেষ্ট। ধূম হইতে আমরা বহ্নির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি, সুনিশ্চিত হইতে পারি না। দৈনন্দিন জীবনে এই সম্ভাবনাই যথেষ্ট কার্যকরী।

কার্যকারণ সম্বন্ধ: চার্বাকপন্থীরা ঘটনাবিশেষের অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণিক সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহেন। দুইটি বিষয়ের প্রত্যক্ষগোচরতা হইতে তাহাদের মধ্যে

কার্যকারণিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমরা দুইটি বিষয় দেখিতেছি: বহ্নি ও ধূম। কি করিয়া বলা যায় বহ্নি ধূমের কারণ—ইহা কিরূপে নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে আমাদের জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরেও ধূম থাকিলেই বহ্নির অস্তিত্ব নিরুপাধিক ও অনিবার্যরূপে বর্তমান ছিল ও থাকিবে? ব্যাপারটি অনুমানের বিষয়; সুতরাং অনিশ্চয়তাদোষে গ্রহণযোগ্য নহে।

ঘটনাবিশেষের হেতুসম্পর্কে চার্বাকরা বলিয়া থাকেন যে সকল ঘটনাই স্বতঃস্ফূর্ত বা আকস্মিক। কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, পশুপক্ষীর প্রবৃত্তিবৈচিত্র্য, ইক্ষুর মধুরতা নিম্বের তিক্ততা—সকলই আকস্মিক পরিণাম বা স্বতই সম্ভব হইয়াছে, ইহা ঈশ্বরনামক কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার সৃষ্টিকৌশল নয়। এই বিপুল পৃথ্বী আকস্মিকভাবেই সৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুর মৌলিক উপাদানগুলির আকস্মিক সম্মেলনের ফলে ইহা উৎসারিত হইয়াছে। এই ধরণের ব্যাখ্যাকে বলা হইয়া থাকে যদৃচ্ছাবাদ। মধ্যপন্থী চার্বাকরা স্বভাবকে পরিদৃশ্যমান বিষয়কালের নিয়ামক বলিয়া মনে করেন, অতিপ্রাকৃত চেতন কোন সত্তাকে সবকিছুর নিয়ন্তা বলিয়া ধারণা করা এইজন্য অবান্তর। এই ধারণা-পদ্ধতিকে স্বভাববাদ বলা হয়।

জড়: চার্বাকরা চারিটি উপাদানকে প্রাথমিক ও শাশ্বত বলিয়া স্বীকার করেন, যথা: ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ। প্রশ্নোপনিষদের ঋষি কবন্ধী কাত্যায়ন অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। ব্যোম প্রত্যক্ষগোচর নহে বলিয়া প্রাচীন চার্বাকরা ইহাকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জড় ও জীব সকল সত্তাই এই ভূতচতুষ্টয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 'অসতঃ সদজায়তঃ'—বৃহস্পতির এই উক্তির নিহিতার্থ হইতেছে যে বস্তুই চরম সত্য। ঋগ্বেদের পরমেষ্ঠীর সংশয়াত্মক মতবাদ সম্ভবতঃ এই উক্তির ভিত্তিমূলে বর্তমান।

চৈতন্য: চৈতন্য মানবদেহের গুণবিশেষ। চৈতন্য সেই সকল জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত যাহাদের আকস্মিক মিশ্রণে মানুষের শরীরযন্ত্র গঠিত। চার্বাকরা মনোগঠন প্রক্রিয়াকে সুরার উপমা দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুরা এমন কতকগুলি উপাদানের সম্মিশ্রণে তৈয়ারী হয় পৃথগ্‌ভাবে যাহাদের নিজস্ব কোন মাদকতা-শক্তি নাই। মনোজগতের বিচিত্র অনুভূতির মাধ্যম আত্মা বলিয়া কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নাই। দেহই আত্মা, 'আমি কৃশ' বা 'আমি স্থূল' প্রভৃতি অভিব্যক্তির 'আমি' বলিতে নিশ্চয়ই দেহ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে বুঝায় না।

দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠনিক উপাদানগুলি নিজ নিজ বিভাগীয় ভূতে মিশ্রিত হয়। সুতরাং কর্মফলভোগ, আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। জড় পদার্থ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি—এই মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পাওয়া যায়। দেহাত্মবাদের অনুকূলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে।

চৈতন্যের কারণ অনুসন্ধানে এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী শাখারা আরও তিনটি মতের প্রবর্তন করেন: ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। যদিও প্রাণ এবং মনকে দেহ হইতে পৃথক্ সত্তা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে তথাপি তাহাদের দেহনিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

ধর্ম: চার্বাকের জ্ঞানতত্ত্ব নূতন বিশ্বাসের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে অনুমানসাপেক্ষ অতিপ্রাকৃত সত্তার উপর ভিত্তি করিয়া। অনুমান অসিদ্ধ বলিয়া অতি-প্রাকৃত সত্তাও অসিদ্ধ। জগতের বিষয়-বৈচিত্র্য বস্তুনিচয়ের স্বভাবের তাড়নায় সংঘটিত হইতেছে; ঈশ্বর বলিয়া অতি-প্রাকৃত কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নাই। সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ ও দয়াময় ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন তিনি জ্ঞানার্থীদের সকল সংশয় দূর করিয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন না কেন? ঈশ্বরকে আমাদের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির বিচারকও বলা যায় না, তাহা হইলে তিনি পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়েন। আমাদের পাপের জন্য যদি ঈশ্বর আমাদের শাস্তি বিধান করেন তবে তিনি আমাদের শত্রুবিশেষ। সুতরাং নিষ্ঠুর ঈশ্বর থাকা অপেক্ষা ঈশ্বর না থাকাই ভাল। বস্তুতঃ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা বা শাসনকর্তা-রূপে ঈশ্বর বলিয়া কাহারও অস্তিত্ব নাই। রাজাই পরমেশ্বর— রাজ্যের একমাত্র শাসক, সামাজিক হিতাহিতের নিয়ন্ত্রণকারী ও চূড়ান্ত বিচারক।

মোক্ষ: সনাতনপন্থীরা মোক্ষ অর্থে সর্ববিধ জাগতিক সম্পর্ক হইতে আত্মার বন্ধনমুক্তি অথবা 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' এমন এক মানসিক অবস্থা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু চার্বাকরা বাস্তববাদী বলিয়া দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। মানুষ সুখদুঃখের অতীতাবস্থা আয়ত্ত করিতে পারে বলিয়াও তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। মোক্ষ বলিতে তাঁহারা বুঝেন স্বাধীনতা, অপ্রতিহত শক্তি অথবা দেহের বিলয়। তাঁহারা মনে করেন যে, যাহারা জনসাধারণের মনে অপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস জন্মাইয়া নিজেদের জীবিকাসংস্থানের সুযোগ করিয়া

থাকে স্বর্গ-নরক তাহাদেরই কল্পনা মাত্র। জাগতিক সীমার বাহিরে স্বর্গ-নরক বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব নাই। সুখই স্বর্গ, দুঃখভোগই নরকধাম। স্বর্গলাভের প্রত্যাশায় ধর্মীয় ব্রতাদি অনুষ্ঠান, দেবতাদের প্রসন্ন করার প্রয়াস, তাঁহাদের সন্তোষবিধানের জন্য প্রার্থনা বা উপচারের আয়োজন—সকলই অর্থহীন। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখভোগ।

জীবনের লক্ষ্য ঃ ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তানায়কদের এই অর্থে দুঃখবাদী বলা যায় যে, তাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষের পশ্চাতে ধাবমান এবং পার্থিব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু জড়বাদীরা সর্বদাই আশাবাদী। তাঁহারা জগৎকে দুঃখময় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে ইহজগতে সুখই একমাত্র বস্তু যাহা সত্য এবং কাম্য, বুদ্ধিমান মানুষের একমাত্র পুরুষার্থ হইতেছে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা অর্থাৎ সুখভোগ—'কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ'। ইহা সত্য যে দুর্ভোগমুক্ত অবিমিশ্র সুখ সম্ভব নয়। রাজার সুরম্য প্রাসাদে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সর্বত্রই দুঃখ আছে। তথাপি আমাদের এই সাধের জগৎ দুঃখের দ্বারা আকীর্ণ নয়। সুখের ভোগ দুঃখ অপেক্ষা অধিক, তাহা যদি না হইত তবে মানুষ এমন ঐকান্তিকভাবে বাঁচিতে চাহিত না, মৃত্যুর নামমাত্র শুনিয়া সশঙ্ক হইয়া উঠিত না। বুদ্ধিমানের কাজ হইতেছে, যতটা পারা যায় সুখভোগ করিয়া লওয়া এবং অনিবার্য দুঃখ যথাসম্ভব বরণ করিয়া লওয়া। দুঃখের ভয়ে সুখভোগের সুযোগ অবহেলা করা মূর্খতা। শল্ক ও কণ্টকের আশঙ্কায় কি আমরা মৎস্যগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব, কণ্টকের ভয়ে কমলসংগ্রহে নিবৃত্ত হইব, তুষাদির জন্য পুষ্টিকর তণ্ডুল গ্রহণ করিব না? দুঃখে অশ্রুপাত করিব, এই জগতে যেমন অভিভূত হইবার মত মৃত্যুশোক বা রোগভোগ আছে, তেমনি সুখ-সহোদর শিশু পুত্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখ আছে, হ্লাদিনী কন্যার লাবণ্যচ্ছটা আছে। মনোরমা ভার্যার আসঙ্গ যদি মর্ত্যকে নন্দনলোকে পরিণত করিতে পারে তবে তাহার বিচ্ছেদ যে গভীর দুঃখের কারণ হইবে, তাহা ত জানা কথা। এই জগতে যদি কোনওরূপ স্নেহের বন্ধন নাও থাকে তবুও দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই, ইহজগতে যাহার আপনার জন বলিতে কেহ নাই তাহার হৃদয় নিরন্তর বেদনাময় ও মরুভূমির মত বিশুষ্ক।

আবার ইহাও ভাবিবার বিষয় যে সুখভোগ তখনই চরমে উঠে যখন দুঃখের বৈপরীত্যে তাহার অনুভব ঘটে। এই কারণে দুর্ভোগ সর্বথা মন্দ নয়। খাদ্য

গ্রহণের আনন্দ ভালভাবে আস্বাদ করিতে হইলে ক্ষুধাজনিত কষ্টভোগ করা দরকার। তৃষ্ণার আর্তি যতই তীব্র হইবে শীতল জলপানের আনন্দ ততই বৃদ্ধি পাইবে। যখন সুদীর্ঘ বিরহভোগের অবসানে প্রণয়িযুগল মিলিত হয় তখন একই ব্যাপার ঘটে। বিরামবিহীন সুখভোগ বিরক্তিকর। আজ যাহা রমণীয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে মুহুর্মুহুঃ আস্বাদনে তাহাই বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে। প্রতিদিনের ব্যবহারে সুস্বাদু খাদ্যও অপ্রীতির কারণ হয়। সুতরাং অবিরাম সুখের জন্য কাতর হওয়া মূর্খতা। এই জীবনে বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা আছে। যতদিন আয়ু আছে সুখভোগের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা সমীচীন। এমন কি 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,' কেন না 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?'

ধারণা হয়, এই সম্প্রদায়ের মতামতগুলি নিন্দক ও বিরোধী পক্ষের হস্তে পড়িয়া কিছুটা বিকৃত হইয়াছে। কখনও কখনও কতকগুলি অশোভন মতামত বৃহস্পতির স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। অস্বাভাবিক মনে হয় এইজন্য যে, যে ব্যক্তি সমাজে গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত তিনি কি করিয়া অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ দান করেন! বৃহস্পতির সুশিক্ষিত শিষ্যেরা বলাৎকারের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন। সামাজিক শৃঙ্খলার আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহারা সর্বদাই অবহিত ছিলেন। বৃহস্পতিকে গণপতি আখ্যাদান, এই চিন্তাধারাকে লোকায়ত নামকরণ এবং 'লোকসিদ্ধো ভবেৎ রাজা'র মত অনুশাসন বাক্যে এই ধারণার অনুকূলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

চার্বাকেরা মানসিক সাম্যের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে সকলের ধমনীতে যখন একই লোহিত রক্ত প্রবাহিত তখন তাঁহাদের মতে জীবনের পরমলোভ্য সুখভোগের সুযোগে সকলেরই সমানাধিকার।

এপিকিউরাস্ অ্যারিষ্টিপ্পাসের সহিত তুলনা ঃ—লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এপিকিউরীয় দর্শনের সহিত চার্বাক চিন্তাপদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। উভয় দর্শনই দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন সত্তা বলিয়া মনে করে। এপিকিউরাসের মতে আত্মা হইতেছে একপ্রকার শারীর বস্তু—চারিটি মূল পদার্থের পরমাণু সংমিশ্রণে গঠিত হইয়া সমগ্র দেহ-সংস্থায় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তবে হৃদয়ের অংশে ইহা অধিকতর ঘনীভূত। চার্বাকরা প্রায় একই কথা বলিয়া থাকেন—ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুর সংমিশ্রণে মনুষ্যশরীর

গঠিত এবং তাহা হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয় অথবা তাহারাই চৈতন্যে পরিণত হয়।

এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্বাকদের সহিত সমস্বরে বলিয়া থাকেন যে, সর্ববিধ মানসিক সুখ শারীরিক ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্পর্কিত ও তাহা হইতে উৎসারিত। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে দুইটি সম্প্রদায়ের বহুলাংশে ঐকমত্য লক্ষণীয়। এপিকিউ-রাসের মতে আমাদের ক্রিয়া-কর্মের মূলীভূত উদ্দেশ্য : সুখলাভ ও দুঃখ পরিহার। দুঃখকে পরিহার করিতে হইবে, সুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে—অগ্নি যেমন উষ্ণ ও বরফ যেমন শীতল ইহাও সেইরূপ সহজ সত্য। প্রত্যেক জীবই স্বভাবতঃ বা প্রবৃত্তির প্রেরণায় সুখের অনুসন্ধান করিতে ও যন্ত্রণা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে, যদি এইভাবে আমাদের সকল উৎসাহ, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সুখদুঃখের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় তাহা হইলে আমরা সুখকেই পরমলভ্য ও দুঃখকে চরম ত্যাজ্য বলিতে পারি। এই বিষয়ে চার্বাকরা একই কথা বলিয়া থাকেন—সুখই পরম পুরুষার্থ, তাহার বিপরীতই নরকবাস।

সাইরেনের অ্যারিষ্টিপ্পাসের সহিত চার্বাক দর্শনের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অ্যারিষ্টি-প্পাসের মতে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তিগত সুখাস্বাদন। ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্তমানের সুযোগ কখনই অবহেলা করা উচিত নয়, কেন না ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত। বর্তমান আমাদের আয়ত্তে বলিয়া ইহার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করা উচিত। 'খাও দাও নৃত্য ক'রো মনের আনন্দে, আগামী কাল আমাদের অস্তিত্ব নাও থাকিতে পারে।'—চার্বাকেরা একই মত পোষণ করেন, আজকের কপোত আগামীকালের ময়ূর অপেক্ষা মূল্যবান'—"বরমদ্যকপোতঃ শ্বোময়ূরাৎ।" "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" চার্বাক-মতের সহিত সমভাবাপন্ন ওমর-খৈয়ামের একটি চরণও এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

ঢালো সুরা ভরি' পাত্র, সদানন্দ অহোরাত্র, যতকাল আছে এই দেহ;
কেন না এ প্রাণ-পাখী, উড়ে গেল সব ফাঁকি, ফিরে হেথা আসে
নাকো কেহ।

(ফিটজেরাল্ড-অনুসরণে)

উপসংহার : স্বাধীন চিন্তার স্রোতকে নিরুদ্ধ করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া যে কু-সংস্কারের আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, ঈশ্বর-চিন্তা বা স্বর্গ-নরকের কল্পনায়

দ্বারা ব্যাহত না হইয়া এই চিন্তাধারা জীবনের মাধুর্যকে নিঃশেষে আস্বাদন করিবার আহ্বান জানাইয়াছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে চার্বাকদের বৈতণ্ডিক কথা বা তত্ত্বোপপ্লববাদ অন্য সম্প্রদায়ের চিন্তাশীলদের সমস্যার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী অধিকতর সংযত সতর্ক ও যুক্তিযুক্ত হইবার সুযোগ পায়। ভারতের প্রত্যেক দার্শনিককে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে তত্ত্বোপপ্লববাদী চার্বাক সম্প্রদায়ের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করিতে হইয়াছিল। কারণ উক্ত সম্প্রদায় প্রচলিত সকল তত্ত্ব-প্রমাণেরই প্রামাণ্য খণ্ডনে প্রয়াস করিয়াছিল। এইভাবে দেখা যায় ভারতীয় দর্শনের উন্নয়নে এই সম্প্রদায়ের অবদান সত্যিই মহৎ।

প্র জ্ঞা প রি মি তি

ছান্দোগ্যোপনিষদের ঋষি আরুণেয় শ্বেতুকেতু পিতাকে বলিলেন—'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতংমতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি'—যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুতিগোচর হইতে পারে, অমননযোগ্য বিষয় মনের অধিগম্য হইতে পারে, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে এইরূপ কোনও উপায় থাকিলে, হে পিতঃ, আমাকে বলিয়া দিন, সেই উপায়টি কিরূপ ? পিতা উত্তরে বলিলেন—'যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং, যথা সোম্যৈকেন লোহ মণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যং, যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্ এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি'—হে সৌম্য, যেরূপে একটি মৃৎ-পিণ্ডকে জানিলে মৃত্তিকা নির্মিত সকল বস্তুই জ্ঞাত হওয়া যায়, মৃত্তিকানির্মিত বস্তুসকলের ঘটকুম্ভাদি নামরূপ পৃথক হইলেও যেমন সকলই মৃত্তিকা ইহাই সত্য, যেরূপে একটি লৌহমণিকে জানিলে দণ্ডশলাকাদি নামরূপ পৃথক হইলেও সকল লৌহনির্মিত পদার্থকেই জানা হয়, কারণ, সকলই লৌহ ইহাই সত্য, হে সৌম্য, যেরূপে একটি কৃষ্ণায়স নির্মিত নখচ্ছেদককে জানিলে

নামরূপাদি পৃথক্ হইলেও সকল কৃষ্ণায়সনির্মিত পদার্থকে জানা হয়, কারণ সকলই কৃষ্ণায়স ইহাই সত্য সেইরূপেই অশ্রুত বিষয় শ্রুতিগোচর, অমত বিষয় মনের গোচর, এবং অবিজ্ঞাত বিষয় জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে। অজানাকে জানিবার উপায় হইল—বিশেষের জ্ঞানের দ্বারা সামান্যের জ্ঞান, ব্যক্তির জ্ঞানের দ্বারা জাতির জ্ঞান, ভূয়োদর্শনের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং সামান্যের জ্ঞানের দ্বারা বিশেষের জ্ঞান, জাতির জ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তির জ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে অনুমান। প্রত্যক্ষের সাহায্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয়ের জ্ঞান এইরূপেই সম্ভব হইয়া থাকে।

কেনোপনিষদের ঋষি বলিলেন—'অন্যদেবতদ্ বিদিতাৎ' যেখানে চক্ষু গমন করিতে পারে না, বাক্য প্রবেশ করিতে পারে না, মনের প্রবেশদ্বার যেখানে অবরুদ্ধ, সেই অবাঙমনসগোচর, অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান কোনও রূপেই সম্ভব নহে, অনুমানের সাহায্যেও নহে।

নাস্তিক চার্বাক এই ঋষির সহিত সুর মিলাইয়াই বলিলেন—'যন্নোপলভ্যতে তন্নাস্তি।' যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই জ্ঞেয়; তদতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় কিছু থাকিলে আমি তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করি না।

বৃহদারণ্যকের ঋষি—দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো, মন্তব্যঃ, যথাক্রমে এই তিনটি শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রত্যক্ষ, শব্দ ও অনুমানের সাহায্যে অজানাকে জানা যাইতে পারে এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ঋষি ইহারই সহিত তাল রাখিয়া বলিয়াছেন—'তমেবং বিদ্বান্ অমৃতমিহ ভবতি; নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়,' অজানা কে জানিবার এই তিনটি মাত্র ক্রমিক পথ; মরণশীল মানব কেবল এই ক্রমিক পথেই অমৃতের সন্ধান লাভ করিতে পারে; নূতন কোনও পথ নাই।

অনুমানের সাহায্যে যে পরম তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্যই ঋষি অন্যত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' পরে হেতু দেখাইলেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি' ইত্যাদি। ঘটাদি কার্যের তুলনায় কারণীভূতমৃত্তিকা যেমন সত্য, জাত-জীবাদি কার্যের তুলনায় কারণীভূত ব্রহ্মও সেইরূপ সত্য। এই জগদ্বৈচিত্র্যরূপ কার্য দেখিয়া পরমপুরুষ-রূপ কারণের অনুমান করিয়াই শ্বেতাশ্বতরের ঋষি—'যঃ কারণানি নিখিলানি তানি' বলিয়া পরমকারণ পরমেশ্বরের কত মহিমা কীর্তন করিলেন। পুরুষ সূক্তে,

দেবীসূক্ত, হিরণ্যগর্ভ সূক্ত, নাসদীয়সূক্ত ও সৃষ্টিসূক্ত ইহাই সমর্থন করিল; গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা ঘরে ঘরে চলিতে লাগিল। সকলেই অনুমান প্রমাণের সাহায্যে কার্যকারণ ভাব ও তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইল এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা পরমাত্মা, পরম পুরুষ, পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জগদ্‌বৈচিত্র্যরূপ কার্যের কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিলেন।

আবার যেমন কার্য মাত্রেরই তাঁহারা কারণ স্বীকার করিলেন সেইরূপ কর্ম মাত্রেরই যে একটা ফল আছে ইহাও অনুমানের সাহায্যেই তাঁহারা স্থির করিয়া লইয়া ফল দেখিয়াই কর্মের অনুমান ও কর্ম দেখিয়া তদনুযায়ী ফলের সুনিশ্চিত প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল সময় ইহজগতে কর্মানুযায়ী শুভাশুভ ফল দেখিতে পাওয়া যায়না। তাই ঋষিগণ পুনরায় অনুমানের আশ্রয় লইয়া জন্মান্তর, পরলোক, আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি প্রভৃতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। অনুমান হইল ঋষিগণের কল্পতরু। অনুমানের নিকট তাঁহারা যাহা চাহিতে লাগিলেন তাহাই পাইতে লাগিলেন।

গর্ভোপনিষদের ঋষি বলিলেন—'অথ নবমে মাসি....পূর্বজাতিং স্মরতি, শুভাশুভঞ্চ কর্ম্ম বিন্দতি—পূর্ব্ব যোনি সহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততোময়া। আহারা বিবিধাভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ ॥ জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃপুনঃ। অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্ ॥ যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম শুভাশুভম্। একাকী তেন দহ্যেহং গতাস্তে ফল ভোগিনঃ ॥' গর্ভের নবম মাসে জীব পূর্বজন্ম স্মরণ করে; পূর্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্মও তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয়। সে ভাবিতে থাকে—আমি কত কত যোনি পরিভ্রমণ করিলাম কত বিবিধ প্রকারের অন্ন আহার করিলাম, কত প্রকারের স্তন্য পান করিলাম। জন্ম হইলেই মৃত্যু; মৃত্যুর পরই পুনরায় জন্ম, আমি আজ দুঃখসাগরে নিমগ্ন; প্রতিকার তো কিছুই দেখিতেছি না। আমি পরিজনবর্গের সুখবিধানার্থ শুভাশুভ, ন্যায়অন্যায় কত কার্যই না করিলাম; কিন্তু আজ তাহারা কোথায়? আমি একাকীই সেই সকল কর্মের ফলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছি। কত দেবযান, পিতৃযান, স্বর্গ, নরক পিতৃলোক আতিবাহিক শরীর, প্রেতশরীর, যমালয়ের কল্পনা হইল। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না—'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে'।

নাস্তিক চার্বাক দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—'নাস্তি'—ঈশ্বর, কর্মফল, জন্মান্তর, পরলোক প্রভৃতি বন্ধ্যাপুত্রের পৌত্রের বিবাহোৎসবের আলোক সজ্জার ন্যায় অলীক পদার্থ।

তোমরা কার্যকারণ সম্বন্ধের বলে ঈশ্বরাদি প্রতিপাদন করিতেছ ; আবার অনুমানের সাহায্যে কার্যকারণ ভাব স্থির করিতেছ। আমি অনুমানেরই প্রামাণ্য স্বীকার করি না। আমার মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না।

প্রমাণ শব্দটির অর্থ সম্যক্ অনুভব। সম্যক্ কথাটির অর্থ সংশয় ও বিপর্যয়শূন্য। অনবধারিত জ্ঞানের নাম সংশয়—যেমন ইহা স্থাণু বা পুরুষ। মিথ্যা জ্ঞানের নাম বিপর্যয়—যেমন দুইটি চন্দ্রমা। স্মৃতিকে প্রমাণ বলা যায় না ; ইহা বুঝাইবার জন্যই অনুভব শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কার মাত্র হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে স্মৃতি বলে—যেমন সে আমার মাতা ইত্যাদি। প্রাচীন অনুভবের বাসনা বা জ্ঞান বা প্রত্যাশাকে সংস্কার বলে। সংস্কার সদৃশবস্তুদর্শনে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া স্মৃতিকে উৎপন্ন করে। অনুভব শব্দটি প্রয়োগ করিয়া প্রত্যভিজ্ঞা বা 'ইহা সেই' এইরূপ জ্ঞানকে প্রমাণের গণ্ডীর বাহিরে ফেলা হইয়াছে। সংস্কার এবং সম্প্রয়োগ বা সম্পর্ক এই উভয় হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে যেমন এইটি সেই ঘট। একমাত্র অনুভবই প্রমাণশব্দবাচ্য। সেই অনুভবটি আবার সংশয় ও বিপর্যয়শূন্য হওয়া আবশ্যক। স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ পদবাচ্য নহে।

চার্বাকের মতে এইরূপ প্রমাণ একমাত্র প্রত্যক্ষই হইতে পারে। সম্যক্ অপরোক্ষ অনুভবের নাম প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ দুই প্রকার—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। এইটি ঘট প্রভৃতি সংজ্ঞাদি বিশিষ্ট পদার্থবিষয়ক প্রত্যক্ষের নাম সবিকল্পক। সংজ্ঞাদির জ্ঞান না হইয়া যেখানে কেবল বস্তু মাত্রের অনুভব হয় এইরূপ প্রত্যক্ষের নাম নির্বিকল্পক।

ন্যায়সূত্রকার গৌতমের মতে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয় শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষজ্ঞান চিরদিনই অব্যভিচারী হওয়া আবশ্যক—'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম'।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ববাদিসম্মত। যাহারা অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করেন তাহারাও প্রত্যক্ষকেই সর্বাপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ, এবং প্রমাণান্তরের মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

তাহাদিগের মতে, প্রত্যক্ষ ব্যতীত ব্যাপ্তিজ্ঞান বা সাধ্যসাধনভাব কিছুই নির্ণীত হয় না ; প্রত্যক্ষ ব্যতীত উপমান উপমেয় ভাবও কল্পনা করা যায়না ; প্রত্যক্ষ

ব্যবহার না থাকিলে প্রথমে কোন শব্দে কিরূপ অর্থ বুঝায় তাহাও জানিতে পারা যায় না ; এই কারণে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে সমস্ত প্রমাণের মূল বলিয়া তাহারা স্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষ ভ্রমের স্থলে প্রকৃত পক্ষে দৃশ্য বিষয়ই বিদ্যমান থাকে না। কেবল দোষবশতঃ অবিদ্যমান বস্তুও বিদ্যমানের ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র; সুতরাং সেখানেও প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞেয় বিষয়ের সহিত মোটেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে না।

প্রত্যক্ষের পরে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা দুর্বল বা প্রত্যক্ষমূলক বলিয়াই অনুমান-প্রমাণবাদীগণের অনুমানের নাম হইয়াছে 'অনুমান' বা প্রত্যক্ষের পরবর্তী প্রমাণ।

মানুষ প্রথমে কোনও স্থানে কোন দুইটি পদার্থের সাহচর্য বা একসঙ্গে থাকা দেখিতে পায় ; সেই সাহচর্য অন্য বহুস্থানে বার বার দেখিয়া দেখিয়া যখন বুঝিতে পারে যে ইহাদের মধ্যে একটি থাকিলে অপরটি নিশ্চয়ই থাকে, আবার অপরটি না থাকিলে এটিও কোথাও থাকে না—উভয়ের মধ্যে একটা অব্যভিচারী সম্বন্ধ রহিয়াছে, একটিকে দেখিলে আপনা হইতেই আর একটির কথা মনে হয় অর্থাৎ পুরাতন ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, তারপর উক্ত স্থানে ঐ দৃষ্ট বস্তুটির, ব্যাপক বস্তুটির (যাহার অভাবে এই হেতু পদার্থটি থাকিতেই পারে না, সেই সাধ্য বস্তুটির) অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ইহার নামই অনুমান প্রমাণ।

ব্যাপ্তি বা হেতুও সাধ্যের সাহচর্য দুই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে—অন্বয়রূপে ও ব্যতিরেকরূপে। যেখানে হেতু আছে বলিয়া সাধ্যের থাকা অনুমিত হয় সেখানে অন্বয় ব্যাপ্তি হয়—যেমন যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানে অগ্নি আছে। যেখানে সাধ্যের অভাবদ্বারা হেতু বা সাধনের অভাব কল্পিত হয় সেইস্থানে ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইয়া থাকে—যেমন যেখানে যেখানে বহ্নি নাই সেখানে সেখানে ধূমও নাই। এরূপ কল্পিত নিয়মের কোথাও ব্যভিচার বা অন্যথা হইলেই ব্যাপ্তি অসিদ্ধ বা দুষ্ট হইবে। হেতু ও সাধ্যের এই সাহচর্য দর্শন কতবার হওয়া আবশ্যক সে বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। সাধারণতঃ ভূয়োদর্শনের দ্বারাই ব্যাপ্তি নিশ্চিত হইয়া থাকে।

অনুমান প্রমাণে প্রধানতঃ হেতু, সাধ্য, ও পক্ষ এই তিনটি বিষয় থাকা আবশ্যক হয়। যাহা অনুমানের সাধন অর্থাৎ যাহার সাহায্যে অনুমান করা হয় তাহার

নাম হেতু, যাহার সম্বন্ধে অনুমান করা হয় তাহার নাম সাধ্য, আর যাহাতে বা যে অধিকরণে সাধ্য পদার্থের সদ্‌ভাব বা অস্তিত্ব অনুমান করা হয় তাহার নাম পক্ষ। সাধারণতঃ চার্বাক ঈদৃশ অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ। ব্যাপ্তিজ্ঞান আবার যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে অগ্নি, এইরূপে নিখিল জগতে পূর্বে উৎপন্ন, সম্প্রতি বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে উৎপৎস্যমান সকল ধূম ও সকল অগ্নির সাহচর্য জ্ঞান অপেক্ষা করে। তাদৃশ সকল ধূম ও সকল অগ্নির জ্ঞান কাদাচিৎক জন্ত মনুষ্যের পক্ষে অর্জন করা কদাপি সম্ভব হয়না।

অতীত এবং অনাগত বা ভবিষ্যৎ সকল ধূম ও সকল অগ্নির অনুমন্তার ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ তো দূরের কথা, নিখিল জগতে সম্প্রতি বিদ্যমান সকল ধূম ও সকল অগ্নির ও অনুমাতার ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইতে পারে না। সুতরাং 'ভূয়োদর্শনের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে' একথাও বলা যায় না। সকল ধূমাগ্নি জ্ঞানাভাবে যে-কোনও একটি স্থলে অগ্নির অভাবেও ধূম থাকিতে পারে এইরূপ ব্যভিচারের আশঙ্কা কখনই নিবারিত হয় না। শঙ্কিত ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিপক্ষগণের যে অনুমান স্থাপিত হয় তাহা যদি জ্ঞান সাধন হয়, হউক, তাহাদ্বারা জ্ঞানের সম্ভাবনা মাত্র করা যাইতে পারে; নিশ্চিত জ্ঞান, এইরূপ সন্দিগ্ধ অনুমানের সাহায্যে কদাপি লাভ করা যাইতে পারে না। এতাদৃশ সন্দিগ্ধ অনুমান প্রমাণপদবাচ্য নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব।

যদি বল, অনুমানের সাহায্যে সকল ধূম ও সকল অগ্নির মধ্যে এই নিত্য সাহচর্য-জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা হইলে সেই অনুমানেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের অপেক্ষা রহিয়াছে। অনুমানের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, আবার ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে অনুমান স্থাপন করিতে হইলে অনবস্থা দোষ দুর্বার হইয়া পড়ে।

আরও, অনুমানবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে ব্যাপ্তির কোনও অংশে ভুল থাকিলে সমস্ত অনুমানটাই ভুল হইয়া যায়। যেমন—পর্বতটিতে অগ্নি আছে; যেহেতু ইহা একটি দ্রব্য। এইস্থলে দ্রব্যত্ব হেতুটি মহানসেও আছে, পর্বতেও আছে, আবার জলহ্রদেও আছে। এইরূপ অনৈকান্তিক হেতুদ্বারা সাধ্যের অনুমান হইতে পারে না। এইরূপ স্থলে হেতুটি দুষ্ট। দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলে; 'হেতুরিব আভাসন্তে' অর্থাৎ হঠাৎ হেতুর মত মনে হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হেতু

নহে ইহাই হেত্বাভাস। হেত্বাভাসমূলক অনুমানের অসত্যতা বা অপ্রামাণ্য অবধারিত।

অনুমানবাদীগণ উপাধির সাহায্যে হেতুর ব্যভিচার বা দোষ নির্ণয় করিয়া থাকেন। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া যাহা হেতুর অব্যাপক হয় তাহার নাম উপাধি। অনুমানপ্রমাণবাদীগণের মতে উপাধিশূন্য অনুমানই নির্দোষ; উপাধি থাকিলেই তাহা দুষ্ট হইয়া পড়ে। যদি কেহ অনুমান করে— পর্বতটি ধূমবান্ যেহেতু ইহাতে বহ্নি আছে তাহা হইলে অনুমানটি ভুল হইবে। এই স্থলে উপাধি থাকিবার সম্ভাবনা আছে। বহ্নি থাকিলেই যে ধূম থাকিবে এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। ধূমের উপাদান বহ্নি নহে—জল। এইজন্য জলহীন তপ্ত লৌহে অগ্নি থাকিলেও ধূম থাকে না। অগ্নি সংযোগে পার্থিব কাষ্ঠাদি হইতে যে জলাংশ উত্থিত হয় তাঁহারই নাম ধূম। সুতরাং উক্ত হেতুর উপাধি হইতেছে আর্দ্রেন্ধন বা ভিজাকাঠ। উপাধিশূন্য হইতে হইলে অন্য নিরপেক্ষ হইতে হইবে। যখন আমরা অগ্নিকে ধূমের নিয়ত সহচর বলিতেছি তখন আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে ধূম অগ্নি ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও পদার্থ সাপেক্ষ নহে। এইরূপ উপাধিশূন্যতা নির্ণয় সর্বত্র সম্ভব নহে; সুতরাং নির্দোষ বা অসন্দিগ্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞানও হইতে পারে না।

শব্দপ্রমাণের সাহায্যেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না. কারণ শব্দ ও প্রমাণ পদবাচ্য নহে। ভাবিয়া দেখ শব্দের দ্বারা কিরূপে জ্ঞান হয়; মনে কর একস্থানে তিনটি লোক উপস্থিত রহিয়াছে—একটি বৃদ্ধ, একটি যুবক ও একটি বালক। বৃদ্ধ যুবাকে বলিলেন, একটি ঘট আনয়ন কর; যুবা একটি দ্রব্য লইয়া আসিল— বালকটি বৃদ্ধের কথা শুনিল, যুবকের কার্যও দেখিল। বৃদ্ধ পুনরায় যুবাকে বলিলেন— ঘটটি রাখ, একটী পট আনয়ন কর। যুবা আনীত দ্রব্যটি রাখিয়া দিল এবং অন্য একটি দ্রব্য আনয়ন করিল। বালক বুঝিল প্রথমে যে দ্রব্যটি আনা হইয়াছিল তাহার নাম ঘট এবং পরে যাহা আনা হইয়াছে তাহার নাম পট। এইরূপে বৃদ্ধব্যবহার দ্বারা অপরিজ্ঞাত শব্দার্থের সহিত লোকের পরিচয় ঘটে। বৃদ্ধব্যবহাররূপ হেতুর সাহায্যেই শব্দার্থের অনুমান হয়; সুতরাং অনুমানকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিলে যে দোষ হয় শব্দকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু বলিলেও সেই দোষই ঘটিয়া থাকে।

মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ' আপ্ত পুরুষের উপদেশবাক্যের

নাম শব্দপ্রমাণ। মহর্ষি কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না- তাঁহারা শব্দকে আংশিকভাবে অনুমান ও আংশিক-ভাবে প্রত্যক্ষের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং মহর্ষি চার্বাকের মতে প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান যেইরূপ অসম্ভব, শব্দের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞানও সেইরূপ অসম্ভব। চার্বাক কোনও মহাপুরুষ বা তৎকৃত গ্রন্থকে তো দূরের কথা যাহাকে নিত্য এবং অপৌরুষের বলা হয় সেই বেদকেও অভ্রান্ত বা আপ্ত বলিয়া স্বীকার করেন না; সুতরাং আপ্তবাক্যও তাঁহার নিকট প্রমাণপদবাচ্য নহে।

উপমানের সাহায্যেও ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। উপমানের সাহায্যে কিরূপে জ্ঞান লাভ হয়—মনে কর কোনও গ্রামবাসী ব্যক্তি কোনও অরণ্যবাসী বৃদ্ধের নিকট শুনিল—অরণ্যে গবয় নামে এক প্রকার জন্তু আছে, তাহা দেখিতে ঠিক গরুরই মত। গ্রামবাসী ব্যক্তিটি অরণ্যে যাইয়া গোসদৃশ একটি প্রাণী দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহার মনে অরণ্যবাসী বৃদ্ধের কথা জাগিয়া উঠিল।—'গোসদৃশ প্রাণীর নাম গবয়'। এই পরিদৃশ্যমান প্রাণীটিও গোসদৃশ। অতএব নিশ্চয়ই ইহা গবয় পদবাচ্য। এই প্রকারে সাদৃশ্য বলে গ্রামবাসী ব্যক্তি একটি অজ্ঞাতপূর্ব নূতন প্রাণীকে জানিতে পারিল। এই যে গবয়ে গো সাদৃশ্য জ্ঞান ইহাই উপমান।

সাঙ্খ্যবাদীগণ উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে ইহা আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ, আংশিকভাবে অনুমান এবং আংশিকভাবে শব্দপ্রমাণের অন্তর্ভূত। গোসদৃশ প্রাণীর নাম গবয়; এই বৃদ্ধবচন শব্দ প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে; অরণ্যে গবয় ও গরুর আকৃতি দর্শন প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না; গোসাদৃশ্য হেতু দৃষ্ট প্রাণীতে গবয় বোধ অনুমানেরই অন্তর্গত। সুতরাং এখানে এমন কোনও অংশ অবশিষ্ট রহিল না যাহার জন্য উপমান নামে নূতন একটি প্রমাণকে স্বীকার করিতে হয়। আবার ইহার সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞানও সম্ভব নহে, কারণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, বা শব্দের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের যে আপত্তি সেই আপত্তি উপমান স্থলেও বর্তমান রহিয়াছে।

অন্যান্য দার্শনিকগণ অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা প্রভৃতিকে যে প্রমাণ বলিয়াছেন নৈয়ায়িকগণ সেই সমুদয় প্রমাণকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান

ও শব্দ এই চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যেই সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাদিগের সাহায্যেও ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হয় না।

অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ; ব্যাপ্তিজ্ঞান কোনও প্রমাণের সাহায্যেই লাভ করা সম্ভব না হওয়াতে অনুমানও অসিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং চার্বাকের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; অনুমান প্রমাণ নহে; অনুমান প্রমাণ না হওয়াতে অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত শব্দাদি সকল প্রমাণই অপ্রমাণ; ইহাই চার্বাকের সিদ্ধান্ত।

যদি অপ্রত্যক্ষ বস্তুরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে কপর্দকহীন দীন দরিদ্রও মনে করিতে পারে যে রাজকোষস্থিত রত্নরাশি তাহারই; ভৃত্য ও আপনাকে প্রভু বা সম্রাট মনে করিয়া আদেশ পালনে বিরত হইতে পারে; এইরূপ করিলে জগৎ হইতে ধনিদরিদ্রভাব বা সেব্যসেবকভাব বিলোপ হইয়া যায় এবং জগদ্‌ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রত্যক্ষাতিরিক্ত কোনও প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষ কোনও নির্দিষ্ট 'ক'-এর কোনও নির্দিষ্ট 'খ'-এর সহিত সম্বন্ধ বলিয়া দিতে পারে; কিন্তু সকল 'ক'-এর সকল 'খ'-এর সহিত সম্বন্ধ বলিতে পারে না, সুতরাং অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষের সাহায্যে লাভ করা যায় না। চার্বাকের মতে—যাহা উপলব্ধি করা যায় না তাহার অস্তিত্ব নাই।

অনুমানবাদীগণের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের যে অনুমান করা হয় তাহার নাম সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান—যেমন চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্ত দর্শনে তাহাদের গতির অনুমান। গতি ব্যতিরেকে এক স্থানের বস্তু কখনও অন্য স্থানে যাইতে পারে না। ইহা সকলস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে পূর্বদিকের চন্দ্র ও সূর্যকে যখন পশ্চিম দিকে উপস্থিত দেখা যায় তখন উঁহাদের গতি প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান দ্বারা জানা যায় যে উহাদের যে অপর দেশ-প্রাপ্তি তাহা নিশ্চয়ই গতিপূর্বক। সূর্য ও চন্দ্র গতিশীল না হইলে কখনই তাঁহারা পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইতে পারিত না; ইহাদের নিশ্চয়ই গতি আছে। সূর্যের গতি সম্বন্ধে এই যে অনুমান ইহা যে ভ্রান্ত ভূগোল বিজ্ঞানই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সাধারণের অতীন্দ্রিয় আত্মা, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল অনুমান প্রায় তাহার সকলগুলিই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের অন্তর্গত। সুশিক্ষিত চার্বাকগণ লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার করিলেও সামান্য-

স্তোদৃষ্ট অনুমানের প্রামাণ্য কদাপি স্বীকার করেন না। এই সুশিক্ষিত চার্বাকগণ লোকপ্রসিদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াই চার্বাক শাস্ত্রের প্রামাণ্য, আকাশের পঞ্চমভূতত্ব এবং স্বভাবনিয়মের মধ্যে কার্যকারণভাব সম্বন্ধও স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু অলৌকিক আত্মেশ্বরাদি বিষয়ের অনুমান স্বীকার করেন না। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্যই তত্ত্ব সংগ্রহের পঞ্জিকাকার কমল শীল বলিয়াছেন—'পুরন্দরস্ত্বাহ লোক প্রসিদ্ধমনুমানং চার্বাকৈরপীষ্যত এব যত্তু কৈশ্চিল্লৌকিকং মার্গমতিক্রম্যানুমানমুচ্যতে তন্নিষিধ্যত ইতি।' ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তও এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—'সুশিক্ষিত তরাঃ প্রাহুর্দ্বিবিধমনুমানম্—কিঞ্চিদুৎপন্নপ্রতীতি, কিঞ্চিদুৎপাদ্যপ্রতীতীতি; ঈশ্বরাদ্যনুমানমুৎপাদ্য প্রতীতি। তত্র ধূমাদ্যনুমানাদেঃ প্রামাণ্যং কেন নেষ্যতে? যত্ত্বাত্মেশ্বর সর্বজ্ঞ পরলোকাদি গোচরম্। অনুমানং ন তস্যেষ্টং প্রামাণ্যং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥' সর্বমতসংগ্রহকার ইহারই সহিত সুর মিলাইয়া বলিলেন—'ইদমন্নং ক্ষুন্নিবর্তকমন্নত্বাৎ হ্যস্তনান্নবৎ ইত্যাদ্যনুমানঞ্চ তত্রৈবান্তর্ভবতি প্রত্যক্ষ মূলত্বাবিশেষাৎ। লোক যাত্রা নির্বাহণ প্রবণং ধূমাদ্যনুমানমিষ্যতে ন পুনঃ স্বর্গাদৃষ্টাদি প্রসাধকমলৌকিকমনুমানমিতি।' অনুমান দুই প্রকার—এই উপস্থিত অন্ন ক্ষুধা নিবারক যেহেতু ইহা অন্ন, গতকল্যকার অন্নের ন্যায় ইত্যাদি লোক যাত্রা নির্বাহণ প্রবণ অনুমান অথবা ধূমাদি দর্শনে অগ্ন্যাদির অনুমানের ন্যায় লৌকিক বা লোকপ্রসিদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য কে না স্বীকার করে? প্রত্যক্ষমূলক এই সকল অনুমান চার্বাকেরও অনভিপ্রেত নহে। তবে লৌকিক মার্গ অতিক্রম করিয়া—আত্মা, ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, পরলোক প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ের সাধক যে অনুমান, চার্বাক মতাবলম্বীগণ তাহাই অস্বীকার করেন।

অনুমানবাদীগণ বলিয়া থাকেন—অনুমান প্রমাণ স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষমূলক হইলেও স্থল বিশেষে নির্দোষ অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষেরও ভ্রান্তি বা অযথার্থতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। আমরা সকলেই সূর্যকে ক্ষুদ্রায়তন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি—কিন্তু অনুমানের সাহায্যে জানি—সূর্য ক্ষুদ্রায়তন নহে, পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ। এখানে নির্দোষ অনুমান দ্বারা সদোষ প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া থাকে। এখানে অনুমানই বলিয়া দেয় যে অতিদূরত্বদোষে তোমরা অত বড় সূর্যকেও ক্ষুদ্র দেখিতেছ; তোমাদের এই প্রত্যক্ষ সত্য নহে, ভ্রান্ত। ব্যবহার জগতে অনুমানের প্রাধান্য সর্ববাদিসম্মত। অনুমানের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও মানুষই কর্তব্য

পথে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। যাহারা অনুমানপ্রমাণ স্বীকার করে না তাহাদের পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবহার নিষ্পাদন করা কখনই সম্ভবপর হয় না। মা কিংবা মাতৃস্থানীয় অন্যকেহ যখন আমাদিগকে কোনও খাদ্যবস্তু ভোজন করিতে দিয়া থাকেন তখন ইহা বিষমিশ্রিত কিনা তাহা পরীক্ষা না করিয়াই স্বচ্ছন্দচিত্তে আমরা ভোজন করিতে থাকি। মাতা কখনই বিষমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিতে পারেন না, এই প্রকার অনুমানই আমাদের ঐ প্রকার ভোজনে প্রবৃত্তির কারণ হয়। গুরু যখন শিষ্যকে উপদেশ দেন তখন শিষ্যের মনোগত অবোধ, সংশয়, বোধ প্রভৃতি ভাব তাহার মুখভঙ্গী বা বাক্যভঙ্গী দ্বারাই অনুমান করিয়া থাকেন। অনুমানপ্রমাণ স্বীকার না করিলে আমাদের সমস্ত ব্যবহারই অচল হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার না করিলে—কেহ সুদূর বিদেশে গমন করিলে তাহাদিগের কামিনীগণের বৈধব্য নিয়ম পালন করা উচিত, যেহেতু দর্শনাভাবের তুল্যতা বশতঃ বিদেশগত ও মৃত ব্যক্তির একই অবস্থা—'ভবাদৃশে দূরবিদেশমাগতে চরন্তু বৈধব্য বিধানমঙ্গনাঃ। অদর্শনেনৈব যতঃ শরীরিণো বিদেশ যাতস্য মৃতস্য তুল্যতা ॥'

ইহার উত্তরে চার্বাকগণের মধ্যে ধূর্ত চার্বাকগণ বলিয়া থাকেন—লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য সম্ভাবনা স্বীকার করা যাইতে পারে। ধূমদর্শনে অগ্নির সম্ভাবনা মাত্র মনে উদিত হয়, নিশ্চয়তা নহে। এবং এই সম্ভাবনার সাহায্যেই সাধারণ লোকব্যবহার চলিতে পারে।

সুশিক্ষিত চার্বাকগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলেন—অনুমানবাদী তার্কিকগণের মতে অনুমান তিন প্রকার—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ দর্শনে কার্যের অনুমানের নাম পূর্ববৎ—যেমন গভীর নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে অচির ভাবী বৃষ্টির অনুমান। বহুবার ঐ প্রকার মেঘ হইতে বৃষ্টি দর্শনের ফলে তাদৃশ মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে একটা অব্যভিচারী কার্যকারণ সম্বন্ধ রূপ ব্যাপ্তি নিশ্চিত হয়। কার্য দেখিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ বলে—যেমন অকস্মাৎ নদীর জল বৃদ্ধি ও বেগদর্শনে অতীত বৃষ্টির অনুমান। যাহা কখনও প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনাও নাই, কেবল সাধারণ নিয়ম অনুসারে বা সামান্য ভাবে যে অনুমান স্থাপিত হয়, চার্বাক সেই অলৌকিক বস্তুসাধক সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের প্রামাণ্যই অস্বীকার করিয়াছেন। তাদৃশ অনুমানের প্রামণ্য অস্বীকৃত হওয়াতে তাদৃশ কার্যকারণ বা প্রকৃতি-বিকৃতি ভাবাদি সম্বন্ধও অস্বীকৃত হইয়াছে।

এইরূপে সামান্যতোদৃষ্ট অলৌকিক অনুমানকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল ও স্বর্গনরকাদি চার্বাকের আঘাতে শূন্যে নির্মিত বাত্যাহত সুরম্য সৌধশ্রেণীর ন্যায় নিরালম্ব ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধ্বসিয়া যায় ; তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে।

কিন্তু, আংশিকভাবে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া সুশিক্ষিত চার্বাকগণ যে ধীরে ধীরে অধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভয়ঙ্করীর উপাসনা

যাহারা কোমলস্বভাব এবং মানসিক শক্তিতে একান্ত দুর্বল তাহারা মনে করে সুন্দরই বুঝি ভগবানের একমাত্র রূপ, শিব বা মঙ্গলই বুঝি ভগবানের একমাত্র ঐশ্বর্য, সত্যই বুঝি তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। তাহারা মনে করে—কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শোভা সম্পদই ভগবানের আশীর্বাদ। দুঃখ, শোক, তাপ, অভাব, অনটন, অতিবৃষ্টি, প্লাবন, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ভূকম্পমারীভয় প্রভৃতি তাঁহার অভিশাপ। তাই প্রকৃতির নগ্ন মূর্তি দেখিলে, উগ্রমূর্তি দেখিলে, রুদ্রমূর্তি দেখিলে, রণরঙ্গ দেখিলে, ধ্বংসলীলা দেখিলে, অথবা ব্যক্তিজীবনে দুঃখ শোক, জরা ব্যাধি প্রভৃতি বিপদ আপদের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইলে তাহারা একান্ত অসহায় হইয়া ভয়ে ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া যায়। তাহারা বিরাট বিশ্বব্যাপী ভগবানকে বড় সঙ্কীর্ণ, বড় ক্ষুদ্র, বড় তুচ্ছ করিয়া দেখে। তাহারা অংশকে, তুচ্ছ অংশকে পূর্ণ বলিয়া ভ্রম করে। তাহারা ভাবিয়া দেখে না—ভগবান কেবল সম্পদের নহে বিপদেরও, কেবল পূর্ণতার নহে রিক্ততারও, কেবল সুন্দরের নহে অসুন্দরেরও, কেবল আলোকের নহে অন্ধকারেরও, কেবল পণ্ডিতের নহে মূর্খেরও, কেবল ব্রাহ্মণের নহে চণ্ডালেরও, কেবল বিভূতির নহে অভূতিরও, কেবল সমৃদ্ধির নহে অসমৃদ্ধিরও, কেবল সুখের নহে দুঃখেরও।

বরং সুখ অপেক্ষা দুঃখের মধ্যে, সম্পদ্ অপেক্ষা বিপদের মধ্যে, সুদিনের আলোক অপেক্ষা দুর্দিনের অমানিশার ঘনান্ধকারের মধ্যে, সূতিকাগারের স্নিগ্ধতা ও পূর্ণতা অপেক্ষা শ্মশানভূমির রুদ্রতা, রুক্ষতা ও শূন্যতার মধ্যে, শান্ত সৌম্য ও কমনীয় সৌন্দর্য অপেক্ষা উৎকট বীভৎস অসুন্দরতার মধ্যেই তাঁহার রূপ অধিক প্রকট, অধিক দীপ্ত, অধিক উজ্জ্বল। সুখের দিনে, সম্পদের দিনে আমাদিগের মধ্যে কয়জন তাঁহাকে স্মরণ করি? দুঃখের দিনে বিপদের দিনেই তো আমরা তাঁহার সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হই। জগতে সুখই একমাত্র সত্যবস্তু নহে, দুঃখও আছে। মানুষ যাহা কিছু গড়িয়াছে বা করিয়াছে তাহা দুঃখেরই অবদান। দুঃখেরই অপর নাম তপস্যা। সুতরাং সুখ ও সম্পদ্ অপেক্ষা দুঃখ ও বিপদেরই মূল্য অধিক। দুঃখ বিপদ, ঝঞ্ঝা প্লাবন ভগবানের অভিশাপ নহে, আশীর্বাদই।

শ্রীসূক্তের শ্রী পদ্মোস্থিতা, পদ্মবর্ণা, পদ্মের ন্যায়ই কোমলস্বভাব, অতিপেলবা। তিনি হিরণ্য-বর্ণা, সুবর্ণরজতস্রজা, হিরণ্ময়ী, সুরূপা এবং সর্বালঙ্কার ভূষিতা। হস্তী, অশ্ব ও রথে তিনি সমৃদ্ধা। তাঁহার উপাসনায় প্রভূত হিরণ্য, অসংখ্য গাভী, অগণিত দাসী, সংখ্যাতীত অশ্ব ও পুরুষ এবং অনপগামিনী লক্ষ্মী লাভ করা যায়।

দুর্বল উপাসক এই শ্রীকেই একমাত্র দেবতা বলিয়া মনে করেন। তিনি কাতরভাবে প্রার্থনা করেন—অলক্ষ্মীর্মেনশ্যতাম্' যাহা কিছু অসুন্দর, যাহা কিছু অশোভন তাহা অনৈশ্বর্য। তাহা বিনষ্ট হউক। অভূতি ও অসমৃদ্ধি আমার গৃহত্যাগ করিয়া যাউক। আমাকে কীর্তি ও ঋদ্ধি দান কর। ইন্দ্র সহায় হইয়া আমাকে ঐশ্বর্যশালী করুন। অভাব, অনটন, রিক্ততা, উগ্রতা ও বীভৎসতা যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। এই সকলের মধ্যে দেবতা নাই। ইহারা শ্রীহীন।

পক্ষান্তরে, পুরুষসূক্তের পুরুষ ও দেবীসূক্তের দেবীর দিকে চাহিয়া দেখুন। পুরুষের সহস্র শীর্ষ, সহস্র চক্ষু, সহস্র পাদ। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া তাহারও ঊর্ধ্বে দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছেন—তিনি বিরাট ও ভয়ঙ্কর। দেবীসূক্তের দেবী শব্দাত্মিকা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, মহতো মহীয়সী, অতিবীর্য পরাক্রমা, অমিত-শক্তির আধারভূতা, রুদ্ররূপিণী ভয়ঙ্করী। তিনি স্বয়ং বলিতেছেন—'আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি, আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি। মিত্র ও বরুণ

—৯

উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। ইন্দ্রকে, অশ্বিদ্বয়কেও আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। আমি ব্রহ্মদ্বেষীর নাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করি। আমি জনহিতার্থে সংগ্রাম করি। আমি দ্যাবা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি। ঊর্ধ্বভাগে দ্যৌকে প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে, বিশ্বভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি, দ্যুলোককে আমি স্বদেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি। বিশ্বভুবন নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্বত্র প্রবাহিত হই। পৃথিবীর পরে দ্যুলোকের পরে যাহা কিছু বিদ্যমান, সর্বত্র আমি আমার মহিমা দ্বারা সম্ভূত হই।' ইহাই হইল দেবীর অনন্ত শক্তিধরা, বিশ্বব্যাপিনী মায়ের সংগ্রামশীল বিরাট মূর্তি। ইহা শান্ত বা কমনীয় মূর্তি নহে, তেজোদীপ্ত উগ্রমূর্তি। দেবী ভয়ানকা। রাত্রিসূক্তের রাত্রি দেবীর অপর নাম সরস্বতী বা বাগ্‌দেবী। তিনিও বিশ্বব্যাপিনী, শক্তিস্বরূপা, ভয়ঙ্করী। তিনি আবার রাত্রির অন্ধকারে পূজিতা এবং কৃষ্ণবর্ণা। পদ্মেস্থিতা পদ্মবর্ণা বা হিরণ্যবর্ণা নহেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া রাখুন। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিলেন—অগ্নির সপ্তজিহ্বা, 'কালী' তাহাদিগেরই অন্যতম। কালী কুসুম-পেলবা নহেন। তিনি তেজোময়ী দাহিকাশক্তির ধ্বংসাত্মিকা দেবতা। তিনি ভয়ঙ্করী। এই কালীর সহিত করালী সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচি ও লেলায়মানার ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিবেন।

ইহার পর গীতায় কালরূপী শ্রীকৃষ্ণের লোকক্ষয়কারী বিশ্বরূপ। তাঁহার দীপ্তানলার্কদ্যুতি, দীপ্তহুতাশবক্ত্র, বহুবক্ত্রনেত্র, বহু উদর, বহু উরু, বহু পাদ, অগণিতদংষ্ট্রা করালবদন, অনন্ত বাহু, দীপ্তবিশাল শশিসূর্য নেত্র। তাঁহার কালানলসন্নিভ ভয়ানক মুখগহ্বরে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, সূতপুত্র এবং উভয় পক্ষের অন্যান্য অবনীপালগণ প্রবেশ করিতেছে। তাহাদিগের কাহারও কাহারও উত্তমাঙ্গ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় তাঁহার দশনান্তরে বিলগ্ন। নদীর বিভিন্ন প্রবাহ যেইরূপ সমুদ্রে বিলীন হয়, পতঙ্গ সকল যেইরূপ প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিয়া ভস্মসাৎ হয় সেইরূপ নরলোকবীরগণ তাঁহার মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইতেছে। তাঁহার মূর্তির আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। তিনি অনন্তবীর্য; নিজের তেজের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উত্তপ্ত করিতেছেন। দ্যুলোক, ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ, দিক্ সমুদয়, সর্বত্রই তাঁহার রূপ, তাঁহার সত্তা। তিনি সমস্ত লোককে গ্রাস করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন। তাঁহার এই উগ্ররূপ দুর্নিরীক্ষ্য। প্রশ্ন হইল 'কো ভবান'? উত্তর আসিল—

'কালোঽস্মি' আমি লোকক্ষয়কারী 'কাল'। 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ' দ্যুলোক, ভূলোক অন্তরীক্ষ এ সকলই আমার অংশমাত্র। দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষ লোকের উপরে যাহা কিছু বর্তমান তাহাও আমারই অংশ। আমি অসীম, অমি অনন্ত, আমি বিরাট। কালরূপী কৃষ্ণ ভয়ানক। তিনি বিশ্বরূপ। এই রূপের সহিত দেবীসূক্তের দেবীর বিরাট উগ্ররূপ মিলাইয়া দেখুন। 'কাল' এবং 'কৃষ্ণ' এই দুইটি নামও লক্ষ্য করিবেন।

ইহার পর মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যের কালী। তিনি করালবদনা, বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিণী, বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা, নরমালাবিভূষণা, দ্বীপিচর্মপরীধানা, শুষ্কমাংসা, অতিভৈরবা, অতি বিস্তারবদনা, জিহ্বাললনভীষণা নিমগ্নারক্তনয়না এবং নাদাপূরিতদিঙ্মুখা। তিনি ভৈরবনাদিনী, ভীমাক্ষী এবং করালবক্ত্রান্ত-দুর্দশ দশনোজ্জ্বলা। কালী অসুরগণের সহিত সংগ্রামে এক একটি মহাসুরকে টানিয়া ধরিয়া দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া গিলিয়া ফেলিতেছেন, কাহাকেও বা অসিদ্বারা, কাহাকেও বা খড়্গদ্বারা নিহত করিতেছেন। এইরূপে অসুরগণের সকল সৈন্য নিপতিত হইলে চণ্ড ও মুণ্ড অগ্রসর হইলেন। দেবী প্রথমে চণ্ডের কেশাকর্ষণ করিয়া অসিদ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহার পর মুণ্ড আসিলে তাহাকেও খড়্গ দ্বারা ভূপাতিত করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইলে প্রচণ্ডাট্টহাসা কালী চণ্ডের মুণ্ড এবং মুণ্ডের দেহ চণ্ডিকাকে উপহার দিলেন। এই দেবী কালীর রণরঙ্গিণী মূর্তি এবং চণ্ডের মুণ্ড বস্তুটিকে ভুলিবেন না। যুদ্ধক্ষেত্র এবং খড়্গ-খানিও মনে রাখিতে পারেন। পুরাণের কালী রণোন্মত্তা ভৈরবনাদিনী, ভয়ানকা। ইহার সহিত দেবীসূক্তের সংগ্রামপ্রিয়া বাগ্দেবী, গীতার কালরূপী কৃষ্ণ এবং তন্ত্রের কালী বা শ্যামাকে মিলাইয়া দেখিবেন।

তন্ত্রের কালী দণ্ডখট্বাঙ্গধারী, দংষ্ট্রাভীম মুখ, ব্যাঘ্রচর্মাবৃত কটি, রক্তবাসা, ঊর্ধ্বকেশ, মুণ্ডমালা বিভূষিত, জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ড, ত্রিনেত্র এবং উগ্র জ্বলনের ন্যায় ভয়ঙ্কর মহাকালের সহিত বিপরীতরতাতুরা। তিনি করালবদনা, ঘোরা, মুক্ত-কেশী, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, মহামেঘপ্রভা, শ্যামা, দিগম্বরী, কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী, গলদ্রুধিরচর্চিতা, ভয়ানকা, ঘোরদংষ্ট্রা, সৃক্কদ্বয় গলদ্ রুধিরধারা বিস্ফুরিতাননা। তিনি ঘোররাবা। তিনি মহারৌদ্রী। তিনি শ্মশানালয়বাসিনী। তিনি বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতা। তিনি খড়্গমুণ্ডধরা। যুগ্মশব তাঁহার কর্ণা-বতংস, শবসমূহের কর সংহতি দ্বারা নির্মিত তাঁহার কাঞ্চী। শবরূপী মহাদেবের

হৃদয়োপরি তাঁহার সংস্থান। তিনি দন্তুরা। তাঁহার চারিদিকে ঘোররাবা শিবার দল বিচরণ করিতেছে। দেবী উগ্ররূপা হইয়াও বরাভয়করা। ভয়ানকা হইয়াও প্রসন্নবদনা, ললজ্জিহ্বা হইয়াও হাস্যযুক্তা। তিনি অমানিশার ঘোর নিশীথের অন্ধকারে আবির্ভূতা।

এইবার মায়ের দিকে চাহিয়া দেখুন। চিনিতে পারিতেছেন তো? বেদের দেবতা রুদ্রের দক্ষিণ মুখ ও বাম মুখ স্মরণ করুন, তাহা হইলেই মায়ের প্রসন্নতা উগ্রতার মূর্তি, শিব ও কালী, মঙ্গল ও অমঙ্গলের মূর্তি চিনিতে পারিবেন। এই দুইটি মিলাইয়াই তো মায়ের বিশ্বরূপ। বাগ্‌দেবীর পঞ্চাশল্লিপিই তো মায়ের মুণ্ডমালা। মাতৃকান্যাসাদি লক্ষ্য করিলে মা যে বেদের শব্দময়ী বাগ্দেবী তাহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না। বেদের দেবী বাক্‌ও সংগ্রামপ্রিয়া এবং বিশ্বরূপিণী। রাত্রি দেবীও শব্দময়ী সরস্বতী। তিনি আবার মায়ের মত রাত্রিকালে পূজিতা এবং কৃষ্ণবর্ণা। ইহার পর মুণ্ডক উপনিষদের অগ্নির সপ্ত জিহ্বাকে স্মরণ করুন, তাহা হইলে হয়ত মায়ের 'কালী' এই নামের করালী এবং ধূম্রবর্ণা এই দুইটি বিশেষণের এবং লেলিহান জিহ্বার সন্ধান পাইবেন। অগ্নিজিহ্বা ও রুদ্ররূপা প্রলয়ঙ্করী। তাহার পর গীতার কালরূপী কৃষ্ণকে স্মরণ করুন। কালকে চিনিলেই কালীকেও চিনিতে পারিবেন। কৃষ্ণ দূর্বাদল শ্যাম, মা আমার মহা মেঘপ্রভা শ্যামা। এখনও কি চিনিতে পারিতেছেন না? যদি না চিনিয়া থাকেন তবে দুর্গা সপ্তসতীর চামুণ্ডারূপিণী কালীকে স্মরণ করুন। চামুণ্ডাকে চিনিলেই মায়ের রূপের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন। মা-ই তো চণ্ড এবং মুণ্ডকে বধ করিয়া চামুণ্ডা হইয়াছেন। মা আমার অবৈদিক বা বেদবাহ্য নহেন। তিনি শক্তিভূতা সনাতনী।

মায়ের এই রূপ সুদুর্দর্শ। যাহারা দুর্বল, যাহারা ভীরু, যাহারা কাপুরুষ, তাহারা মায়ের এ রূপ সহ্য করিতে পারেন না। মায়ের এ রূপ দেখিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠিবে। তাহারা বলিবে—এ রূপ অসুন্দর, এ রূপ বীভৎস, এ রূপ উৎকট, এ রূপ ভয়ানক, এ রূপ বৌদ্ধ, এ রূপ অস্বর্গ্য, এ রূপ অনার্য। ইহা ভগবানের রূপ নহে। আমরা কেবল কোমলকান্ত রূপ দেখিতে চাই, দিব্য রূপ দেখিতে চাই, প্রসন্ন রূপ দেখিতে চাই। আমরা কেবল শ্রীকে চাই, শোভা সম্পৎকে চাই। ক্ষুৎপিপাসাকুল রিক্ততা চাই না, অভূতি অসমৃদ্ধি চাই না। কিন্তু মায়ের বীর সাধকের চিত্ত সবল ও দৃঢ়। সে এই বিরাট বিশ্বরূপ,

ভয়ানকের রূপ দেখিয়া হর্ষপুলকিত হইয়া বলিবে—'হৃষিতোস্মি দৃষ্ট্বা'। সে অর্জুনের ন্যায় বলিবে না—'দর্শয় দিব্যরূপম্'। সে রুদ্রের ভীরু সাধকের ন্যায় বলিবে না—'রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'। সে বলিবে—এই নগ্নতা, এই রিক্ততা এই ভীষণতা এই বীভৎসতাই তো মা তোমার জ্যেষ্ঠ রূপ। ইহাই তো তোমার দুঃখের রূপ, তপস্যার রূপ, ক্রোধের রূপ, ধ্বংসের রূপ, প্রলয়ের রূপ, উগ্র রূপ। তুমি তো কেবল সুখ নহ দুঃখও, কেবল সুন্দর নহ অসুন্দরও, কেবল শিব নহ কালীও, কেবল সত্য নহ ভ্রান্তিও, তুমি যে বিশ্বরূপা জগন্ময়ী।

মায়ের বীর উপাসক বিশ্বরূপার উপাসনা করিয়া, উপাস্য উপাসকের ভেদ ভুলিয়া বিশ্বময় আপনার অস্তিত্ব, মায়ের অস্তিত্ব. অনুভব করে। তখন সুন্দর অসুন্দর, কঠিন কোমল, শিব অশিব সকলেই সমান হইয়া যায়। সুখ দুঃখও এক হইয়া যায়। সে পরমানন্দের আস্বাদ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। সে দুঃখ দৈন্য, বিপদ্ আপদ্ প্রভৃতি সকল দুর্যোগকেই আনন্দময়ী মায়ের রূপ ভাবিয়া, নিজের প্রতিচ্ছবি ভাবিয়া, সাদরে গ্রহণ করে। কোনও অবস্থায়ই খিন্ন বা বিষণ্ণ হয় না।

জীবজগতে মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কিছুই নাই। ভয়ঙ্করীর উপাসক মৃত্যুর বিভীষিকাকেও আনন্দময়ী মায়েরই প্রতিচ্ছবি ভাবিয়া মৃত্যুকেও ভয় না করিয়া, মৃত্যুঞ্জয় হইয়া, অমৃতত্ব লাভ করে।

অনেকের মতে গৌড় দেশেই এই ভয়ঙ্করী মায়ের উপাসনার, মৃত্যুঞ্জয়ী এই মহাবিদ্যার প্রতিষ্ঠা—'গৌড়ে প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যা'।

নির্দেশিকা